ব্যাবিলন কথকতা

১৭ তম সংখ্যা

০১ ডিসেম্বর ২০২২

BABYLON

কৃষি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায়
ব্যাবিলন সীড

BABYLON

facebook.com/babylonagro

www.babylonagrodairy.com

ডিসেম্বর ০১, ২০২২

সম্পাদক
এসএম এমদাদুল ইসলাম

সহ-সম্পাদক
রুমানা আক্তার

বিশেষ সহযোগিতা
আরিফ হোসেন
সুবন পাথাং

প্রচ্ছদ
মাহবুব শিপু

অলংকরণ
আব্দুল্লাহ আল রানা ফরহাদ

সার্বিক শিল্প নির্দেশনা
এসএম এমদাদুল ইসলাম
রুমানা আক্তার

সহযোগিতা
ব্যাবিলন পরিবার

মুদ্রণ
অক্ষর প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিসার্স
কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫
৮৬২২৯০১, ০১৯৩৬-১৫৬১০০

BABYLON

সূচিপত্র

শুভেচ্ছা বাণী			৪
সম্পাদকীয়			৬
হাওয়ার অ্যাম্বুলেন্স	:	ইথার আখতারুজ্জামান	১০
বন্ধু	:	সাদিয়া আলম	১১
তুষার মানব	:	এস এম আরিফ রাজ্জাক	১৪
তুমি দেখেছো কি?	:	আব্দুল্লাহ আল রানা ফরহাদ	২২
ভয়	:	মনিরুল হাসান মিঠু	২৬
জীর্ণ শহরের, জীর্ণ ছাতা	:	সানজিদা আফরোজ তিথি	৩০
নারী জাগরণ	:	মো. সোহেল রানা	৩৪
সোনার দেশ	:	শেখ মৃন্ময় জামান	৩৫
আমার প্রিয় নড়াইল	:	নাছিমা খানম	৩৬
এক ভিন্ন সংস্কৃতির গল্প	:	সুবন পাথাং	৩৭
আমার ক্যারিয়ার ভাবনা	:	মুহাম্মদ সাইফুল হক	৪২
প্লুটো	:	এসএম এমদাদুল ইসলাম	৪৬
রাজিয়া-সাহাবুদ্দিনের স্বপ্নের সংসার	:	প্রদীপ কুমার দত্ত	৫৫
জাগরণ	:	সজীব কুমার	৫৯
বৃষ্টি	:	মো. আসাদুজ্জামান আশিক	৬০
সময় এখন	:	মো. নূর ইসলাম	৬১
প্রতিজ্ঞা শপথ	:	মোছা. মমিনা বেগম	৬২
মানসিক স্বাস্থ্য কে দেখবে?	:	সাব্বির আহমেদ	৬৩
কিছু স্মৃতি, কিছু গল্প আর কিছু হাসি	:	আয়েশা সিদ্দিকা আরজু	৬৬
একটি ভূতের গল্প	:	মো. মহসীন	৭০
শুক্রবারের গল্প	:	আরিফ হোসেন	৭৯

মা	:	মো. কামরুল হাসান	৮৭
আমার এক চিলতে সুখ	:	তরিকুল ইসলাম	৮৮
আমার বাবা	:	মো. সাদ্দাম আলী	৮৯
ফেরারি স্মৃতি	:	শরীফ রাজ	৯০
ছুটি	:	এম এম তোফাজ্জল হোসেন	৯১
সফর অথবা শিক্ষা সফর	:	রুমানা আক্তার	৯৫
ও.আর.এস.	:	ডা. মো. দিদারুল করিম	১০২
পথের বাঁকে	:	মো. শাহজালাল মিয়া পলাশ	১০৪
তবে এ কেমন ভালোবাসা!	:	মো. ফরহাদ হোসেন নির্জন	১০৭
ইংরেজি	:	রাকিব হাসান	১০৮
ভূমণ্ডলের কথকতা	:	মানিক বণিক	১০৯
গোল্ড কয়েন	:	উম্মে সালমা ডালিয়া	১১০
St. Martin's Island Revisited	:	আরিফ ভুঁইয়া	১১৩
ফটো অ্যালবাম			১১৭-১১৯

শুভেচ্ছা বাণী

আহসান হাবীব
কার্টুনিস্ট, লেখক

ব্যাবিলন একটি বেশ বড় মাপের গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠান। এর পরিবেশ, নিয়ম-কানুন, রক্ষণা-বেক্ষণ সবই চমৎকার। তবে এই প্রতিষ্ঠানের চমকপ্রদ যে বিষয়টি সবাইকে চমকে দেয় সেটি হচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানে 'ব্যাবিলন কথকতা' নামে নিজস্ব একটি ঘরোয়া প্রকাশনা আছে। লিটল ম্যাগাজিন ফর্মেটে, একটি চমৎকার দৃষ্টিনন্দন সাহিত্য পত্র। বছরে একবার এটি প্রকাশিত হয়। এই সাহিত্য পত্রে গার্মেন্টসের শ্রমিক-কর্মকতা-কর্মচারী সবাই লিখতে পারেন।

এটির যিনি সম্পাদক, প্রতিবার প্রকাশনার পূর্বে একাধিকবার ঐ সাহিত্য পত্রে যারা লিখতে ভালোবাসেন, যারা গ্রাফিক ডিজাইন বা শিল্প নির্দেশনার দায়িত্বে আছেন বা যারা নিয়মিত লিখছেন... মোট কথা এই প্রকাশনার সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের নিয়ে আলোচনা সভা করে থাকেন। সেখানে শিল্প-সাহিত্য সবকিছু নিয়ে খোলামেলা আলোচনা হয়।

এই রকম একটি আলোচনা সভায় আমার থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। আমার বেশ ভালো লেগেছে তাদের কথাবার্তা শুনে, তাদের সাথে আলাপচারিতায় সময় কাটিয়ে। ব্যক্তিগতভাবে আমি যেটা বিশ্বাস করি– সেটা হচ্ছে মানুষ মূলত একটি সৃজনশীল অস্তিত্ব বিশেষ; তাদের কোনও না কোনও ভাবে সৃজনশীলতার সাথে যুক্ত থাকা উচিৎ এবং এক্ষেত্রে সাহিত্য চর্চা একটি অন্যতম মাধ্যম হতে পারে।

একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক বলেছিলেন, 'সংসার জীবনের একটি সাধারণ বাজারের

ফর্দও যদি সুন্দর করে লিখা হয় তাহলে সেটাও একটা মিনিয়েচার সাহিত্য হতে পারে।' এই সুন্দর করে লেখার ব্যাপারটা আসলে চর্চা, যেটা ব্যাবিলনের নিজস্ব সাহিত্য সাময়িকী 'ব্যাবিলন কথকতায়' করা হয়ে থাকে।

এই সুন্দর সৃজনশীল প্রক্রিয়াটি আমার জানামতে নিয়মিতভাবে বহুদিন ধরে অব্যাহত আছে এবং আগামীতেও থাকবে এমনটাই আমরা আশা করতে পারি। আমার ধারণা এখান থেকেই একদিন সম্ভাবনাময় সাহিত্যিক, সাংবাদিক, প্রবন্ধকার, কবি বা শিল্পীর আত্মপ্রকাশ ঘটবে। যা সামগ্রিক অর্থে জাতির জন্য একটি সৌভাগ্যময় ঘটনা বলে বিবেচিত হবে।

সম্পাদকীয়

এসএম এমদাদুল ইসলাম
পরিচালক
ব্যাবিলন গ্রুপ

কোভিড-১৯ এর মহাদুর্যোগটাই ছিলো কল্পনাতীত ও অভূতপূর্ব। দুর্ভাবনা ছিলো কোভিড মোকাবেলা করতে করতে পৃথিবীর বুক থেকে সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে ডাইনোসর বিলুপ্ত হবার মতো মনুষ্যজাতিই না বিলুপ্ত হয়ে যায়। বছর দুই ধরে শ্বাসরুদ্ধভাবে লড়তে লড়তে অস্তিত্বরক্ষা যখন হলো তখন মনে হচ্ছিলো সামনে রয়েছে স্বাভাবিক দিনের হাতছানি। ২০২১ চলে যাচ্ছিলো মন্দ বছরের খতিয়ানে, ২০২২ শুরু হয়েছিলো অনেক প্রত্যাশার ভেতর দিয়ে। আমরা ভেবেছিলাম গেলো দুবছরের ক্ষয়ক্ষতি সামলে ঘুরে দাঁড়াবার বছর হবে এটা। শুরুটা তেমনই হয়েছিলো বটে। কিন্তু কে জানতো মাত্র চারটা মাস যেতেই আবার সব এলোমেলো হয়ে যাবে? রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ আমার কোনও হিসেবের মধ্যেই ছিলো না। ফলে তার জন্য মানসিক প্রস্তুতিরও কোনও প্রশ্ন নেই। অল্প সময়ের মধ্যে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও যেকোনও অশুভ জল্পনাকল্পনাকে হার মানিয়ে দিলো। জ্বালানি তেলের দাম রাতারাতি অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়া, ডলারের বিপরীতে টাকার মান দারুণ ভাবে পড়ে যাওয়া, ব্যাঙ্কে ডলার সঙ্কট তৈরি হওয়া - এগুলো খুব খারাপ আলামত বটে। এক সাথে এতোগুলো খারাপের মুখোমুখি আমরা এর আগে আর হইনি। সব মিলে মনে হলো লোকে যে বলে একই গাছের ওপর দুবার বজ্রপাত হয় না, এই ধারণা মিথ্যেই প্রমাণিত হয়ে গেলো। পুরো বিশ্বের মাথার উপর পরপর দুবার বজ্রপাত হলো যেন। কবে যে আবার একটা স্বাভাবিক পৃথিবী ফিরে পাবো তার কোনও ঠিক নেই।

এ রকম পরিস্থিতিতে ব্যাবিলন কথকতা এই বছর প্রকাশ করা যাবে না এমনটাই ছিলো স্বাভাবিক। কিন্তু কঠিন সময়ের হাত ধরে এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃঢ়তার জন্য অবশেষে প্রায় অসম্ভবই সম্ভব হলো। পত্রিকার সকল লেখক লেখিকাকে ধন্যবাদ দিতে হবে সবার আগে, কিন্তু তারও আগে পত্রিকার সহকারী সম্পাদককে। রুমানা সকল প্রফেশনাল ব্যাপারেই দৃঢ়তা দেখায়। পত্রিকার ক্ষেত্রে একটু কম মনোযোগী সে যদি হতো তো এটি এ বছর চোখ মেলতে পারতো না।

গত তিনবছর ধরে ঝড়ঝাপ্টা সয়ে সয়ে আমাদের ব্যাবিলনের দলটি যোগ্যতর হয়েছে। আমার ভালো লাগে ভেবে যে একটু ধীরে হলেও নতুন সি ই ও তার দলটির ভার নিয়ে নিয়েছেন একটু একটু করে, ঢুকে যাচ্ছেন তিনি সবকিছুর ভেতরে।

এই অভূতপূর্ব কঠিন সময়ে ক্রেতাদের তরফ থেকে একটু সহানুভূতি ও সহযোগিতা যদি আমাদের গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি পেতো তো ভালো হতো, সঙ্গতও হতো সেটা। আমাদের ইন্ডাস্ট্রি ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় প্রতিনিয়ত ছোটোবড়ো সকল ক্রেতার বিপদে এগিয়ে এসেছে, আসছে। কিন্তু এর কোনও যোগ্য প্রতিদান বড়োদের কাছ থেকে ইন্ডাস্ট্রি পাচ্ছে না।

শত প্রতিকূলতার ভেতরেও ব্যাবিলন পরিবারে স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডে উল্লেখযোগ্য কোনও ঘাটতি এ পর্যন্ত হয়নি। অল্প-বিস্তর উন্নয়ন কাজ চলেছে। ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার লি. এর লাইন সংখ্যা বেড়েছে। সবগুলো প্রোডাকশন ইউনিটে কম বা বেশি নতুন মেশিন এসেছে মেশিনারিতে আধুনিকায়নের লক্ষ্যে। প্রোডাকশন লাইন কিছু বেড়েছে আমাদের অবনী নীট ফ্যাক্টরিতেও। ব্যাবিলন ওয়াশিং ইউনিটটি তার নতুন ও বড়ো পরিসরের মহলে প্রবেশ করেছে বহুলাংশে। ব্যাবিলন ট্রিমস লি. এ যুক্ত হয়েছে আরেকটা হাইডেলবার্গ প্রিন্টিং মেশিন। এরা চালু করেছে তাদের রিসাইকল প্লান্টখানাও। ব্যাবিলন এগ্রি ও ডেয়ারি কোম্পানি তাদের প্রথম ডিহিউমিডিফায়িং প্লান্ট চালু করতে পেরেছে।

গুরুত্বপূর্ণ দুটো ভিজিটও সংঘটিত হয়েছে এ বছর। বছরের গোড়ার দিকে নেদারল্যান্ডস এর রাষ্ট্রদূত ও অক্টোবরে জার্মান সংস্থা জি আই জেড এর উদ্যোগে একটি জার্মান দলের ভিজিট ছিলো খুবই উল্লেখযোগ্য।

ম্যানেজমেন্ট পর্যায়ে বড়ো এক সংযোজন হয়েছে। আমাদের মানব সম্পদ বিভাগে জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে যোগ দিয়েছেন জনাব সুলতান মাহবুবুল হক। এ ছাড়া দীর্ঘদিন ধরে শূন্য থাকা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং চিফ পদটিও পূরণ হতে যাচ্ছে সহসা। এটাও একটা বড়ো খবর – দরকারি সংযোজন।

ব্যাবিলন কথকতার গত সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হয়ে এসেছিলেন বহুকাল ধরে জনপ্রিয় পত্রিকা উন্মাদ -এর সম্পাদক জনাব আহসান হাবীব। ইনি এমনই ভালো এক মানুষ যে এর মধ্যে একবার আমাদের এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে স্বশরীরে অংশ নিয়ে উপস্থিত সবাইকে লেখার ক্ষেত্রে প্রচুর অনুপ্রেরণা দিয়ে গেছেন তিনি। তার সহজসরল বক্তব্য সাধারণত সহজেই সবার মন ছুঁয়ে যায় – তাই গিয়েছিলো সেদিন। বর্তমান সংখ্যার শুরুতে তাঁর শুভেচ্ছা বক্তব্য রয়েছে। তাঁকে আমাদের সবার পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

এ বছর আমাদের বৃহত্তর ব্যাবিলন পরিবারে বড্ড এক বিয়োগান্ত ঘটনা ঘটে গেছে। অবনী ফ্যাশনের ফিনিশিং প্রধান কামাল সাহেব একটা সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছে – চলে গেছে আমাদের সবাইকে ছেড়ে জাগতিক মায়া কাটিয়ে। দীর্ঘ অনেকগুলো বছর সে ব্যাবিলনকে দিয়ে গেছে তার সংক্ষিপ্ত জীবন থেকে। আমাদের দুঃখটা বেশি বড়ো করে লাগে এই কারণেও যে সে ব্যাবিলনে তার এক কর্মদিবসে রাস্তা পার হতে গিয়ে ধাবমান এক গাড়ির ধাক্কায়

মাথায় আঘাত পায় ও তা থেকেই মৃত্যুবরণ করে। তার আত্মার চির শান্তি কামনা করা ছাড়া আমরা তার জন্য আর কিছু করতে পারিনি যা ওপারে গিয়ে তার কাজে লাগতে পারে। কামাল সাহেবের রেখে যাওয়া পরিবারের সকল সদস্য স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারুক এটা আমাদের কামনা। ব্যাবিলন যেখানে সম্ভব সেখানে তাদের পাশে দাঁড়াবে।

আরেকটা বিয়োগ ব্যথা ব্যাবিলনে আমাদের সবাইকে ছুঁয়েছে এবার। ২০০৪ সাল থেকে যাত্রা শুরু করে অবশেষে পথ চলা থেকে সরে দাঁড়াতে হয়েছে আমাদের ফ্যাশন ব্র্যান্ড ট্রেন্ডজকে। আমাদের গ্রুপে এই ট্রেন্ডজই কঠিন সময়ের প্রথম শিকার। ট্রেন্ডজ এর সকলের প্রতি আমার গভীর কৃতজ্ঞতা এতোকাল এটিকে পরম যত্নে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। আশা করবো আমাদের আর কোনও কোম্পানিকে এই পরিণতির মুখোমুখি হতে না হয়। আমরা নিশ্চয় চেষ্টা করবো ট্রেন্ডজকে তার অকাল সমাধি থেকে ভবিষ্যতে কোনও এক সময় আবার পুনর্জীবন দানের। হয়তো ভিন্ন কোনও আঙ্গিকে, এমনকি হয়তো ভিন্ন কোনও নামে।

এবারের সংখ্যায় যে সব লেখা স্থান পেয়েছে তার ভেতর থেকে ক'খানা আমার ব্যক্তিগত ভাবে খুব ভালো লেগেছে। ক'জন উদীয়মান লেখক লেখিকার উঁকিঝুঁকি আমি দেখতে পেয়েছি। এরা লিখে গেলেই হয়। তবে এই একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত হতে পারি না। এর আগে এরকম ভালো লিখেও কেউ কেউ পরে আর দম ধরে রাখতে পারেননি। তারা আর লিখেননি নাকি লিখেও দেননি তা জানতে পারিনি। নিজেদের এই পত্রিকাটির প্রতি কারও কোনও অভিমান তৈরি হয়েছে কিনা কোনও কারণে কে বলবে।

রানা ফরহাদকে আবার ফিরে পাওয়া গেছে পত্রিকার ভেতরস্থ সকল চিত্রাঙ্কনের জন্য। এটা পাঠক-পাঠিকামাত্র লক্ষ করবেন ও পছন্দ করবেন এই বিশ্বাস আমার রয়েছে। পেন্সিল বা কলমের স্বল্প টানে চিত্র এঁকে ফেলার গুণটি রানার দারুণ ভালো লাগে আমার। রানা নিজেও লেখে, ফলে বিষয় অনুধাবন করে সেই অনুযায়ী চমৎকার আঁকে সে।

ব্যাবিলন ফটোগ্রাফি ক্লাব নিষ্ক্রিয় হয়ে থেকেছে বেশ অনেককাল ধরে। এই ক্লাবের সদস্যদের মধ্যে সম্প্রতি চাঞ্চল্য ফিরে এসেছে কিছুটা। ক্লাবের সদস্যদের তোলা ছবি থেকে সেরা কিছু ফটো দিয়ে একটা ঘরোয়া প্রদর্শনি করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়ে ক্লাব-মেম্বারদের কেউ এগিয়ে এলে সেটা সম্ভব হতে পারে আগামীতে।

একটু সুদিন আসলে এ যাবৎ প্রকাশিত ব্যাবিলন কথকতার সকল সংখ্যা থেকে বাছাই করা লেখা দিয়ে একটা সংকলন প্রকাশের ইচ্ছা রইলো। এই পরামর্শটা আমাদের বন্ধু ও সুহৃদ জনাব ইলাহিদাদ খানের কাছ থেকে বেশ আগেই পেয়েছিলাম।

বিশেষ কারণে এবার ব্যাবিলন কথকতার

বর্তমান সংখ্যাটি চলে আসা চল থেকে বের হয়ে এসে একটু আগেই প্রকাশিত হলো। তাও এটাতো ডিসেম্বর মাসই। তাই সকলকে মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জানাতেই পারি। শুভেচ্ছা বিজয় দিবসের ও মাস শেষে নতুন ইংরেজি বছরের।

অটুট থাকুক ব্যাবিলনের উন্নত শির।

হাওয়ার অ্যাম্বুলেন্স

ইথার আখতারুজ্জামান
প্রাক্তন সিনিয়র অফিসার, মার্কেটিং অ্যান্ড মার্চেন্ডাইজিং
ব্যাবিলন গ্রুপ

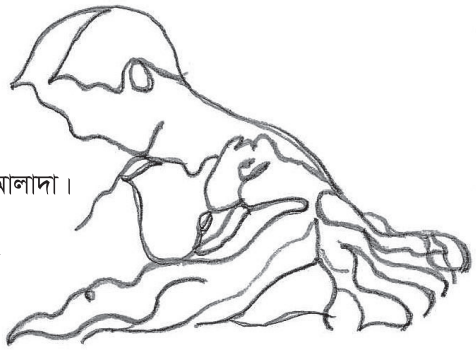

বিচ্ছেদ যেহেতু অবশ্যম্ভাবী,
কিছুক্ষণ পাশে বসো, জানালা খুলে দাও
আমরা কিছুক্ষণ অহেতুক গল্প করি..
চলো আমরা একসাথে শেষবারের মতন
যৌথভাবে খানিকক্ষণ আকাশ দেখি
এরপরতো তোমার আর আমার আকাশ আলাদা।

চুপ থেকো না, আমাদের সময় ভীষণ অল্প
কথা বলো! তবে চোখে চোখ রেখো না
তোমাকে ভুলে যেতে হবে আমার ডাকা
তোমার যাবতীয় ব্যক্তিগত ডাক নাম
তোমাকে ভুলে যেতে হবে সব ভুল।

আমাদের আর সময় নেই,
আমাদের এখন বলতে হবে-
'যতটা পারো ভালো থেকো
নিজের খেয়াল রেখো'
আমি শব্দহীনতায় বলবো অজস্র কথা।
এরপর হয়তো তোমার দিকে শেষবার তাকিয়ে বলে ফেলবো-
'আমাকে খুব বেশি মনে পড়লে,
হাওয়ার অ্যাম্বুলেন্স করে দুঃখ পাঠিয়ে দিও জরুরি বিভাগে।'

বন্ধু

সাদিয়া আলম
সিনিয়র কোয়ালিটি ইন্সপেক্টর, কোয়ালিটি
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

বন্ধু মানে সোনালি দুপুর,
মেঘলা দিনের গান।
বন্ধু মানে সুখ-দুঃখ,
ভাগ সমান সমান।

বন্ধু মানে কান্না-কষ্টের,
সুখের হাসি ঝরে।
বন্ধু মানে সাথে থাকা,
আস্থা মেলে অন্তরে।

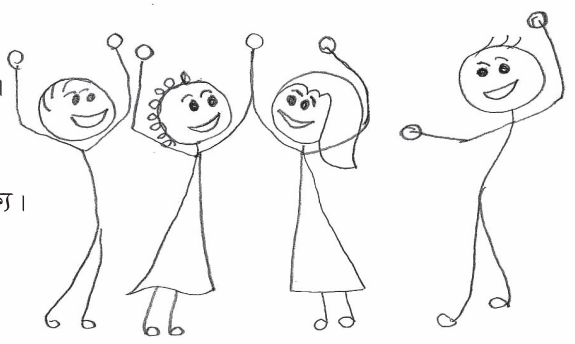

বন্ধু মানে হারবে জেনেও,
এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য।
বন্ধু মানে হাল না ছাড়ার,
মজবুত এক পক্ষ।

বন্ধু মানে আশ্চর্য প্রদীপের,
আঁধার রাতের আলো।
বন্ধু মানে অন্যায়ের বিরুদ্ধে,
প্রতিবাদী আগুন জ্বালো।

বন্ধু মানে উৎসাহ যোগানোর,
প্রথম প্রধান ধাপ।
বন্ধু মানে ভালোবাসা,
সফলতারই প্রতাপ।

নাম– জোহারিন শাহমুন, **শ্রেণি–** ১ম, **বিদ্যালয়–** অ্যাপল ট্রি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল।
সম্পর্ক– মেয়ে।
মো. শাহজালাল মিয়া পলাশ, এজিএম, ইনফরমেশন টেকনোলজি, ব্যাবিলন গ্রুপ।

নাম– তাসকিন হোসেন, **শ্রেণি–** ৬ষ্ঠ, **বিদ্যালয়–** মনিপুরী উচ্চ বিদ্যালয়।
সম্পর্ক– ছেলে।
মো. আব্দুল আউয়াল, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, মেইনটেনেন্স, ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড।

নাম– আয়েশা হাবিবা, **শ্রেণি–** নার্সারি, **বিদ্যালয়–** আল-আরাফাহ্ ইসলামিক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল।
সম্পর্ক– মেয়ে।
মুহাম্মদ আমিন আখতার, এজিএম, মার্কেটিং অ্যান্ড মার্চেন্ডাইজিং, ব্যাবিলন গ্রুপ।

নাম– মানতাশা মাহনূর, **শ্রেণি–** নার্সারি, **বিদ্যালয়–** ইক্করা ইন্টারন্যাশনাল স্কুল।
সম্পর্ক– মেয়ে।
সোহেলী সুরাইয়া ছাদেক, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, মার্কেটিং অ্যান্ড মার্চেন্ডাইজিং, ব্যাবিলন গ্রুপ।

তুষার মানব

এস এম আরিফ রাজ্জাক
সিওও
ব্যাবিলন ট্রিমস লিমিটেড

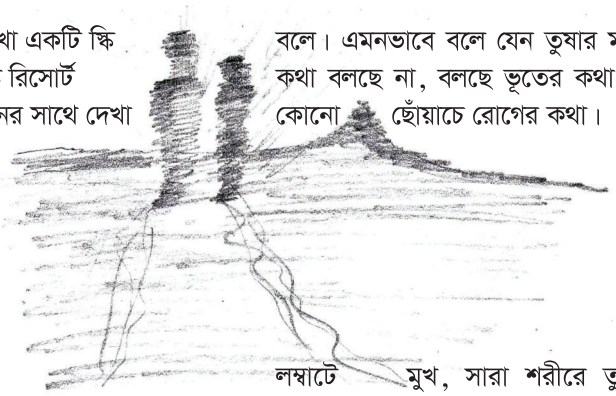

ওর সাথে প্রথম দেখা একটি স্কি রিসোর্টে। এমন স্কি রিসোর্ট একজন আইসম্যানের সাথে দেখা হবার জন্য বড়ই উপযুক্ত স্থান। হোটেল লবিতে বসেছিল লোকটি। লবিটি আগত এবং বিদায়ী অতিথিদের ভীড় এবং তাদের উচ্চকিত কথাবার্তায় গমগম করছিল। লবির এক কোণে ফায়ারপ্লেসের পাশে একা বসে বই পড়ায় মগ্ন সে। লবির এই শোরগোল, উপস্থিত মানুষজনের ব্যস্ততা, কোন কিছুই তাকে স্পর্শ করে না। মাঝ দুপুর, শীতদিনের কুয়াশা কাটিয়ে আলোর প্লাবন। কাচ গলে আলো এসে ওর শরীরে পড়ে রুপালি মূর্তির মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল।

'তুষার মানব!'
আমার এক বান্ধবী ফিসফিসিয়ে বলে।

জানতাম না তুষার মানব আসলে কে! কেনই বা তাকে তুষার মানব বলা হয়! বন্ধুরা শুধু এটুকু বলতে পারে যে তাকে সবাই এই নামেই ডাকে।
'মানুষ ওকে তুষার মানব বলে ডাকে কারণ হয়তো সে তুষার দিয়ে তৈরি।'- এক বন্ধু বলে। এমনভাবে বলে যেন তুষার মানবের কথা বলছে না, বলছে ভূতের কথা অথবা কোনো ছোঁয়াচে রোগের কথা।

লম্বাটে মুখ, সারা শরীরে তুষারের পলেস্তারা, মাথায় সাদা শজারু কাঁটার মতো খাড়া চুল। ওর চোখদুটো শুভ্র, শান্ত, তাকালে মনে হয় শরীর ভেদ করে মন দেখতে পায়। এছাড়া সব কিছুই স্বাভাবিক মানুষের মতো। লবির কোনায় বসে নিবিষ্ট মনে বই পড়ছে মানুষটি। মূর্তির মতো স্থির। চার পাশের কোন কিছুই তাকে স্পর্শ করছে না। তার এই শরীরী মুদ্রা যেন এটাই প্রমাণ করতে চাইছে যে সে একা। পরের দিন দুপুরেও তাকে হোটেল লবির সেই একই কোণে বসে বই পড়তে দেখলাম। সন্ধ্যায় স্কি স্লোপ থেকে হোটেলে ফিরে দেখি সেই একই ভঙ্গিতে বসে গভীর মনোযোগ দিয়ে বই পড়ছে। পরের দিনও সেই একই স্থানে একই চেয়ারে তাকে বসে বই পড়তে দেখি। চতুর্থ দিন বিকেলে স্কি স্লোপে না যেয়ে হোটেলের বাইরে বাগানে বসে সংবাদপত্র নিয়ে পড়ার ভান করলাম। মাঝেমাঝে লবির দিকে তাকাচ্ছিলাম।

হোটেলের অতিথিরা সবাই গিয়েছে স্কি স্লোপে। সুনসান লবি, পরিত্যক্ত শহরের মতো জনশূন্য। লবির কোনায় তুষার মানব একমনে বই পড়ে চলেছে। হোটেলের বাইরে ভেসে বেড়ানো কুয়াশার হালকা পর্দা ভেদ করে তুষার মানবকে রহস্যময় দেখাচ্ছিল।

কেন যেন মনে হলো ওর সাথে কথা বলার জন্যই স্কি স্লোপে না যেয়ে হোটেলে থেকে গিয়েছি। সমস্ত দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে লবির দিকে এগোলাম। যদিও আমি খুব লাজুক প্রকৃতির মেয়ে, তবুও ভেতর থেকে প্রচণ্ড তাগিদ অনুভব করছিলাম ওর সাথে কথা বলার। কাল চলে যাবো, আজকেই শেষ রাত এখানে। আজ ওর সাথে কথা না বললে হয়তো আর কোনোদিন ওর সম্পর্কে কিছুই জানতে পারবো না। ওর পাশে যেয়ে দাঁড়ালাম।

'স্কি করতে যাওনি?'
ধীরে মাথা তুলে তাকায় তুষার মানব। মনে হলো একাত্ব হয়ে বরফের উপত্যকা ছুঁয়ে দূরে বয়ে যাওয়া বাতাসের শিস শুনছি।
'স্কি করতে ভালো লাগে না।' এমনভাবে উত্তর দিলো যেন কতদিনের চেনা আমি।
ওর বলা কথা যেন অনেক দূর থেকে ভেসে এলো।
'বই পড়তে আর তুষার দেখতে ভালো লাগে!' আঙ্গুলে জমা আলগা বরফ ঝাড়তে ঝাড়তে বলে।

ওর সাথে কথা বলার কিছু খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তুষার মানব আমার চোখে চোখ রাখে, ওর ঠোঁটে হালকা হাসি। ঠিক বুঝলাম না সে হাসছে কি না। হতে পারে সেটা আমার দেখার ভুল।

'বসবে? বুঝতে পারছি আমার সম্পর্কে জানার জন্য উৎসুক হয়ে আছো! ঠিক বলেছি কি?' চাপা কণ্ঠে তুষার মানব বলে 'ভয় পাবার কিছু নেই! আমার সাথে কথা বললে তোমার ঠান্ডা লাগবে না!'

লবির সোফায় যেয়ে বসলাম দুজন। ছাদ থেকে মেঝে অব্দি নামানো কাচের জানালা দিয়ে বাইরের সবকিছু দেখা যায়। বাইরে শিমুল তুলোর মতো বাতাসে ভেসে ভেসে তুষারপাতের দৃশ্যে চোখ জুড়িয়ে যায়। হট কুকার অর্ডার দিলাম, তুষার মানব কিছুই পান করবে না। আমার মতোই সেও লাজুক। কী বলবো ভেবে পেলাম না। আবহাওয়া দিয়ে কথা শুরু করলাম, এরপর হোটেল প্রসঙ্গ।

'তুমি কি একাই এসেছো এখানে?' প্রশ্ন করি।
'একাই এসেছি, তুমি কি স্কিয়িং এর জন্য এসেছো?'
'নাহ, আমার বান্ধবীরা জোর করে এনেছে, আমি ভালো স্কি করতে পারি না!'
খুব জানতে ইচ্ছে করছিল তুষার মানব কী খায়, গ্রীষ্মে কোথায় থাকে, ওর পরিবার আছে কি না ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাকে হতাশ করে নিজের সম্পর্কে কোনো কথা বলে না সে। বুঝতে পারলাম নিজের সম্পর্কে কথা বলতে সে পছন্দ করে না। উল্টো আমার খবরাখবর নিতে শুরু করলো, আমার পরিবার, কোথায় লেখাপড়া করেছি, বন্ধুবান্ধব ইত্যাদি। এমন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলো যে বিষয়গুলো আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম।

খুব লজ্জা লাগছিল, মনে হলো জনসমক্ষে আমি উলঙ্গ হয়ে গেছি।
'আমার সম্পর্কে এত কথা কেমন করে জানলে?' প্রশ্ন করলাম। 'তুমি কি মাইন্ড রিডার?'
'নাহ, আমি মানুষের মন পড়তে পারি না, কিন্তু আমি জেনে ফেলি। মানুষের চোখে চোখ রাখলে সব জেনে যাই!'

খুব অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম।
'আচ্ছা তুমি কি ভবিষ্যৎ দেখতে পাও?'
'নাহ, ভবিষ্যৎ দেখতে পাই না!' উদাস কণ্ঠে মাথা নাড়িয়ে বলে তুষার মানব। 'আমি ভবিষ্যৎ দেখতে চাই না। তুষার ভবিষ্যৎকে জানে না, চেনে না, তুষার অতীতকে জানে, চেনে, অতীত জমাট বেঁধে থাকে তুষারের হৃৎপিণ্ডে। জীবন্ত অতীত তুষারের মাঝে নির্ভয়ে বাস করে। তুষার সযত্নে তাদের রক্ষা করে, এটাই তুষারের ধর্ম।'

'খুব খুশি হলাম তোমার কথা শুনে!' হেসে বললাম ওকে। কেন যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম এটা জেনে যে ও ভবিষ্যতের কথা জানে না!

টোকিওতে ফিরে যাবার আগে কয়েকবার ওর সাথে ডেটিং হয় আমার। নাহ, সিনেমা, মুভি, বার, কফিশপে যেয়ে ডেটিং নয়। তুষার মানবকে কখনো কিছু খেতে বা পান করতে দেখিনি। ওর সাথে ডেটিং হতো পার্কের বেঞ্চে পাশাপাশি বসে বা পার্কে হেঁটে বেড়িয়ে। রাজ্যের কথা হতো শুধু ওর নিজের সম্পর্কে ছাড়া।

একদিন নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলাম না। বলেই ফেললাম 'আচ্ছা এতো কথা বলো, তোমার নিজের সম্পর্কে কিছু বলো না কেন? কোথায় জন্মেছো, তোমার বাবা মা কোথায়, কেমন ভাবে তুষার মানবে পরিণত হলে?'

এই কথা শুনে তুষার মানব এক দৃষ্টিতে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে।
'তুমি যে প্রশ্ন করলে সেটার উত্তর আমার জানা নেই।' খুব শান্ত কণ্ঠে জবাব দেয় সে। দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে সে, নাক দিয়ে সাদা ধোঁয়ার মত নিঃশ্বাস বের হতে দেখি। 'আমার কোন অতীত নেই, আমি সবার অতীত জানি, কিন্তু আমার অতীত আমারই জানা নেই। আমি জানি না আমার বয়েস কত, অথবা জানি না আদৌ আমার বয়েস হয়েছে কি না।'

ওকে দেখে মনে হলো তুষার মানব আঁধারে ভাসমান পথহারা এক আইসবার্গ। অনুভব করলাম গভীরভাবে ওর প্রেমে পড়ে গেছি। আমারও যেন আর কোন অতীত নেই, নেই ভবিষ্যৎ। বর্তমানই আমার সব কিছু, আমার বর্তমান, আমার তুষার মানব। আমার স্নায়ুতন্ত্র ছেয়ে যায় এক অদ্ভুত সুখানুভূতিতে। কথা গড়ায় দুজনের ঘর বাঁধার স্বপ্নে। আমি তখন কুড়ি বছরের তরুণী। তুষার মানব আমার জীবনের প্রথম প্রেম। তুষার মানব আমাকে ভালো না বাসলেও আমি তাকে ভালোবেসে ফেলেছি।

বাবা মাকে আমার এই সম্পর্কের কথা জানালে তারা আঁতকে ওঠে। অজানা মানুষের সাথে বিয়ের কথা তারা কল্পনাও করতে পারে না। আত্মীয়স্বজনকে কী বলবে তারা। আর সে তো তুষার মানব।

শরীরের তুষার গলে গেলে তাকে তো আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিয়ে হলে বরকে অনেক সামাজিক দায়-দায়িত্ব নিতে হয়। সে একজন তুষার মানব। সে কেমন ভাবে এইসব দায়িত্ব পালন করবে? তাদের এইসব ধারণা একেবারে ভুল। তুষার মানব আসলে তুষার দিয়ে তৈরি নয়, সে তুষারের মতো শীতল। আর তাই উষ্ণ আবহাওয়ায় সে গলে যাবে না। তার শরীর ঠান্ডা কিন্তু সেটা ওই ঠান্ডা নয় যা অন্যের শরীরকে ঠান্ডায় আক্রান্ত করবে। সব জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে আমরা বিয়ে করে ফেললাম। পরিবার, আত্মীয়স্বজন কেউ আমাদের এই বিয়েতে খুশি হয় না। আর তাই বিয়ের কোন অনুষ্ঠানও হয় না। তুষার মানবের কোন পারিবারিক পরিচয় না থাকায় আমাদের বিয়ে রেজিস্ট্রি করা সম্ভব হলো না। বিয়ের রাতে ছোট্ট একটি কেক কেটে আমরা দুজন বাসর রাতের অনুষ্ঠান উদযাপন করলাম। কয়েক দিনের মধ্যে ছোট্ট একটা অ্যাপার্টমেন্ট খুঁজে সেখানে গিয়ে উঠলাম। তুষার মানব একটি হিমায়িত মাংস কারখানায় কাজ নেয়। শীত ওকে আক্রান্ত করতে পারে না। কঠোর পরিশ্রমেও সে ক্লান্ত হয় না। খুব সামান্য খাবার গ্রহণ করে সে। কোন কাজে না নেই তার। এইসব কারণে কারখানার মালিকের প্রিয় পাত্র হয়ে ওঠে তুষার মানব। আমরা সুখে ঘরসংসার করতে থাকি।

ওর সাথে মিলনের সময় আমি কল্পনা করি বরফ শীতল নির্জনতাকে। শক্ত বরফ, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বরফখণ্ডকে। সেই বরফ খণ্ডটি হয়তো এই পৃথিবীর কোন এক প্রান্তে আছে সেটা আমার জানা নেই, হয়তো সেটার খোঁজ তুষার মানবের জানা। ওর বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মিলিত হতাম শুদ্ধতম নীরবতায়। আমি যেন মিলিত হতাম সুদূর অতীতের সাথে, মিলিত হতাম তার সাথে, যে ধারণ করে আছে হাজার হাজার বছরের অতীতকে।

এক কথায় আমরা সুখী দাম্পত্য জীবন যাপন করছিলাম। পরিবার পরিজন থেকে দূরে থেকেও আমাদের সুখের যেন কমতি ছিল না। আস্তে আস্তে বাইরের মানুষদের সাথে তুষার মানবের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তারা তুষার মানবের সাথে কথা বলতে শুরু করে। তারা বুঝতে পারে তুষার মানব আসলে তাদেরই মতো একজন মানুষ তবে শারীরিক গঠনে সে ভিন্ন। তুষার মানবকে তারা গ্রহণ করলেও ওর সাথে আমার বিয়ের সম্পর্ককে কেউই মেনে নিতে পারেনি।

অনেক চেষ্টা করার পরেও আমরা সন্তান নিতে ব্যর্থ হলাম। এটার কারণ হয়তো আমাদের জেনেটিক গঠনের পার্থক্য। সন্তান না থাকায় সকালে সাংসারিক কাজ শেষ করে দিনের বাকি সময় অলস কাটাতে হয় আমাকে। মা এবং বোনের রাগ তখনো প্রশমিত হয়নি তাই তারা আমার কোনও খোঁজ খবর নেয় না। তুষার মানব কাজে থাকলে আমি অলস সময় বই পড়ে অথবা রেডিওতে গান শুনে সময় কাটাই। ক্রমেই এই একাকিত্ব আমাকে কুঁড়ে খেতে শুরু করে। একদিন তুষার মানবকে বলেই ফেলি কোথাও থেকে বেড়িয়ে আসার জন্য।

'বেড়াতে যাবে? আমরা দুজন কি সুখী নই?' - ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করে তুষার মানব।
'নাহ সেটা নয়, আমি সুখী! কেন যেন মন টিকছে না! দূরে বহু দূরে যেতে চাই। সেই

স্থান দেখতে চাই যে স্থান আমি আগে কখনো দেখিনি, যেখানে আগে কখনো যাইনি। বুঝতে পারছো? এছাড়া আমরা তো এখনো হানিমুনেই যাইনি কোথাও। বেশ কিছু টাকা জমেছে আর তোমার ছুটিও পাওনা হয়েছে, আমরা সুন্দরভাবে ছুটি কাটাতে যেতে পারি!'

বরফকুঁচি আবৃত আঙ্গুলগুলো কোলের উপর রেখে তুষার মানব দীর্ঘশ্বাস নেয়।
'ঠিক আছে!' তুষার মানব বলে 'যখন বেড়াতে যেতেই চাইছো, আমরা যাবো! তবে আমার মনে হয় এমন ভ্রমণে যাওয়া ঠিক নয়। তোমাকে সুখী দেখতে চাই। কোথায় যেতে চাও বলো!'
'সাউথ পোলে যেতে চাই!' কেন যেন মনে হলো সাউথ পোলের বরফ রাজ্য তুষার মানবের পছন্দ হবে। সত্য কথা বলতে সাউথ পোল নিয়ে আমার আকর্ষণ ছিল সবসময়। অরোরা বোরিয়ালিস আর পেঙ্গুইন দেখার কথা ভাবতাম। ফারের পার্কা পরে অরোরার রহস্যময় আলো মেখে পেঙ্গুইনদের সাথে খেলা করার কথা কত যে কল্পনা করেছি! তুষার মানব আমার চোখের দিকে অপলক তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। ওর দৃষ্টি যেন আমার চোখ ভেদ করে মস্তিস্কের স্মৃতিকোষে পৌঁছায়। কিছুক্ষণ নীরব থেকে কী যেন ভেবে নেয় সে। তার পরে বলে-
'ঠিক আছে, তুমি চাইলে অবশ্যই আমরা সাউথ পোলে যাবো। ভেবে দেখো ওখানেই যেতে চাইছো তো?
মাথা নেড়ে সায় দিলাম ওর প্রশ্নের উত্তরে।
'সাউথ পোল যাত্রার জন্য গোছগাছ করো, আমি ছুটি নিয়ে নিচ্ছি!'

ওর কথার উত্তরে আমি কিছুই বলতে পারলাম না। ওর বরফ শীতল দৃষ্টি যেন সংক্রামিত করলো স্নায়ুতন্ত্রকে। আমি যেন চিন্তা করার শক্তি হারিয়ে ফেললাম।

কেন যেন মনে হচ্ছিল সাউথ পোল যাত্রাটা ঠিক হচ্ছে না। কেন এমন মনে হচ্ছে সেটার কারণ খুঁজে পেলাম না। এরপর থেকে তুষার মানবের মাঝে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। ওর চোখের দৃষ্টি যেন আরো তীক্ষ্ণ দেখায়, ওর আঙ্গুলে আরো তুষার চূর্ণ জমা হয়। তুষার মানব আরো শান্ত এবং গম্ভীর হয়ে পড়ে। খাওয়া কমিয়ে দেয়। আমি ভেতরে ভেতরে বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি। যাত্রার পাঁচ দিন আগে সিদ্ধান্ত নেই সেখানে না যাবার, ওকে বলি সাউথ পোলে এখন প্রচণ্ড শীত, ওখানে না যেয়ে বরং আমরা ইউরোপে বা স্পেনের কোথাও যাই। বুল ফাইট দেখে, পানাহার করে মজার সময় কাটানো যাবে। তুষার মানব আমার প্রস্তাবে সায় না দিয়ে গভীর দৃষ্টিতে আমার চোখে চোখ রাখে। ওর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে আমি যেন অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিলাম।

'স্পেন আমার মোটেও পছন্দ নয়। ওখানে প্রচণ্ড গরম আর ধুলোবালিতে পূর্ণ। আর ওখানকার খাবার খুব মসলাদার। ইতিমধ্যে সাউথ পোলে যাবার টিকেট, তোমার জন্য বুট, ফার পার্কা কিনে ফেলেছি। এখন আমাদের বেড়ানোর স্থান পরিবর্তন করা সম্ভব নয়!'

একটি আতঙ্ক আমাকে গ্রাস করে, কেন যেন মনে হয় সাউথ পোলে আমাদের জন্য অশুভ কিছু অপেক্ষা করছে। রাতে দুঃস্বপ্ন

দেখলাম। তুষার আবৃত রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছি, হঠাৎ গর্তে পড়ে গেলাম, ক্রমশ ডুবে যাচ্ছিলাম গর্তটিতে, আর আমার শরীর জমাট বরফে পরিণত হচ্ছিল। জ্ঞান ছিল কিন্তু কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছি। প্রতিটি মুহূর্তে আমি যেন অতীতের অংশ হয়ে যাচ্ছিলাম। আমার যেন কোন ভবিষ্যৎ নেই! দেখতে পেলাম পথচারীরা আমার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে কিন্তু গর্ত থেকে টেনে তোলার জন্য কোন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে না। তারা যেন আমার অতীতকে দেখতে পাচ্ছে। আমি যেন অতীত থেকে সুদূর অতীতে হারিয়ে যাচ্ছি। ঘুম ভেঙ্গে যায়, পাশে আমার স্বামী তুষারমানব গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। সাদা শবের মতো শুয়ে। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম। কান্নার শব্দ শুনে ওর ঘুম ভেঙ্গে যায়। শূন্য দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে যেন নীরবে জানতে চাইলো কী হয়েছে। তুষার ধবল হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নেয়। কান্নাজড়িত কণ্ঠে ওকে বলি সদ্য দেখা দুঃস্বপ্নের কথা। মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে আমাকে সান্ত্বনা দেয়, বলে 'এটা একটা স্বপ্ন, স্বপ্ন কখনো ভবিষ্যৎ থেকে আসে না, অতীত থেকে আসে। তুমি স্বপ্নকে নিয়ন্ত্রণ করবে, স্বপ্ন তোমাকে নয়।' ওর এই সান্ত্বনাবাণী শুনে কিছুটা ভালো বোধ করি।
'ঠিক বলেছো, কিন্তু আমি নিশ্চিত নই!'

সব জল্পনা কল্পনার শেষে আমরা সাউথ পোলের প্লেনে উঠি। ছোট্ট প্লেনটিতে আমরা ছাড়া সবাই সাউথ পোলের অধিবাসী, বেড়ানো বা কাজ সেরে তারা দেশে ফিরছে। আমরা ছাড়া কোন টুরিস্ট নেই প্লেনটিতে। যাত্রীরা কেউ একে অপরের সাথে কথা বলছে না, এমন কি স্টুয়ার্ড এবং প্লেনের ক্যাপ্টেনও উড়ানের আগে সতর্কবাণী শোনায় না। এক অস্বস্তিকর নীরব উড়ান। জানালার পাশের সিটে বসেছিলাম নিচের দৃশ্য দেখবো বলে কিন্তু সেই আশার গুড়ে বালি। ক্ষীরোদ মেঘ ভেদ করে প্লেন উড়ে চলে আর তাই মেঘ ছাড়া কিছুই দেখতে পাই না। যতই সাউথ পোলের কাছাকাছি হতে থাকি বাইরে জানালার কাচে তুষারের আস্তরণ জমে আর তাই একসময় চলমান মেঘকেও দেখতে পাই না। সারাটা পথ আমার স্বামী তুষার মানব বই পড়ে সময় কাটিয়ে দেয়। ছুটি কাটানোর যাত্রাপথে যে উত্তেজনা, আনন্দ, উচ্ছ্বাস থাকে সেটার কোনকিছুই নেই এই যাত্রায়।

বকসাদা টার্মাকে ল্যান্ড করে প্লেন। অন্য যাত্রীদের সাথে আমরাও পা দেই সাউথ পোলের হালকা তুষার আবৃত মাটিতে। মাটিতে পা দেয়া মাত্র আমার স্বামী প্রচণ্ড ভাবে কেঁপে উঠে। চোখের পলকে ঘটে ঘটনাটি। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলে মানুষ যেমন ভাবে খিঁচুনি নিয়ে কেঁপে ওঠে অনেকটা সেই রকম। মুহূর্তের মধ্যে সে স্বাভাবিক হয়ে যায়। অন্য কেউ লক্ষ্য না করলেও আমার দৃষ্টি এড়ায় না- দেখি মুখ উঁচিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে আছে আর দীর্ঘশ্বাস নিচ্ছে। মুখ নামিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে একটি হাসি উপহার দেয়।

'সাউথ পোলে এলে তাহলে?'
'হুম!'- আমার সংক্ষিপ্ত উত্তর।
সাউথ পোলের মাটি স্পর্শ করা মাত্র ওর প্রতিক্রিয়া তখনো আমাকে ভীষণভাবে ভাবাচ্ছিল।

আমি জানতাম সাউথ পোল পৃথিবীর নির্জনতম স্থান কিন্তু এতটা নির্জন হবে সেটা জানা ছিল না। জনবসতি নেই বললেই চলে। চারিদিকে শুধু বরফ আর বরফ। কুয়াশার চাদরে ঢাকা। তুষারের নিচে প্রায় চাপাপড়া হোটেলে পৌঁছলাম। হোটেলের অতিথি আমরা দুজন মাত্র। সাউথ পোলে টুরিস্ট আসে না বললেই চলে, কিছু গবেষক আসে তবে সংখ্যায় খুব কম। শীতের শুরু তাই গবেষকরাও মেইনল্যান্ডে ফিরে গেছে।

যেমনটি কল্পনা করেছিলাম পেঙ্গুইনের দেখা পাবো, অরোরা বরিয়ালিস দেখতে পাবো। দুটোর একটিরও দেখা মেলে না। স্থানীয় মানুষদের জিজ্ঞাসা করলে তারা শুধু মাথা নাড়ায়। আমাদের ভাষা ওরা বোঝে না, ওদের ভাষাও আমরা বুঝি না। কাগজে পেঙ্গুইন এঁকে ওদের দেখাই, উত্তরে মাথা নাড়ানো ছাড়া কোন উত্তর পাই না। চরম একাকিত্ব গ্রাস করে আমাকে। হোটেলের বাইরে জনমানবহীন দিগন্ত বিস্তৃত তুষার প্রান্তর। কোথাও কোনো গাছগাছালি নেই, নেই ফুল, নেই নদী অথবা দিঘি। তুষারভূমি। আমার স্বামী তুষার মানব মাঝে মাঝে হোটেল থেকে বেরিয়ে আনমনে ইতস্তত হেঁটে বেড়ায়। খুব দ্রুতই তার স্থানীয়দের সাথে বন্ধুত্ব হয়ে যায়, ওদের ভাষাও রপ্ত করে ফেলে। মাঝে মাঝে ওদের সাথে দূরে কোথাও চলে যায়। ওর এই হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়াটা আমার মোটেও ভালো লাগে না। মনে হয় সে আমাকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে, নিজেকে উপেক্ষিত মনে হয়। মাঝে মাঝে দেখতাম সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্থানীয় মানুষদের সাথে কথা বলছে। এত কথা সাউথ পোলে আসার পরে আমার সাথেও বলেনি।

এমন প্রায় জনমানবহীন তুষার আবৃত স্থানে বাস করে আস্তে আস্তে আমার প্রাণশক্তি লোপ পাচ্ছিল। আমি যেন আবেগশূন্য এক স্থবির মানুষে পরিণত হয়ে যাচ্ছিলাম। তুষার মানবের দূরত্ব আমি মেনে নিতে পারছিলাম না। দিন ও রাতের পার্থক্য যেন আমার অনুভূতি থেকে মুছে যায়। আমার অনুভূতি পুরোপুরি ভোঁতা হয়ে গেলেও একটি বিষয় বারবার উঁকি দেয় সেটা হলো যে তুষার মানবকে আমি ভালো বেসেছিলাম, যাকে আমি বিয়ে করেছিলাম সে এই সাউথ পোলে এসে একেবারে বদলে গেছে! সে যেন আমার কাছে এক অচেনা মানুষ হয়ে গেছে। জানি না কেমন ভাবে আবার সেই আগের দিনগুলোতে ফেরত যাবো। এখানে আমার কোন স্বজন নেই যার কাছে আমার দুঃখের কথা বলে মন হালকা করতে পারি। আর একটা বিষয় লক্ষ্য করলাম, সাউথ পোলের স্থানীয় মানুষরা তুষার মানবকে ভালোভাবে গ্রহণ করেছে। আমার সাথে বেশি কথা না বললেও ওদের সাথে হেসে কথা বলতে দেখি। আমি হোটেলের বদ্ধ ঘরের জানালা দিয়ে ধূসর আকাশের দিকে তাকিয়ে শুধু নিজের দুঃখের কথা ভাবি। ভাবি তুষার মানবের মতো আমি কখনই ওদের ভাষা রপ্ত করতে পারবো না আর তাই আমাকে কথা না বলে নীরবেই থাকতে হবে।

আমাদের বহন করে আনা প্লেনটি ছিল সেই ঋতুর শেষ প্লেন কারণ শীতকালের শুরুতে আমরা এখানে এসেছি। রানওয়ে পুরু বরফের নিচে ঢাকা পড়ে যায় ঠিক আমার মনের মতো- এখানে এসে আমার মন যেন

পুরু বরফের স্তরের নিচে চাপা পড়ে গেছে। শীত জেঁকে বসতে শুরু করেছে। তুষার মানব বলে- 'এখানে শীত লম্বা সময় ধরে চলে। পুরো শীতকালে কোন প্লেন সাউথ পোলে আসবে না। দেশে ফেরার জন্য বসন্ত অবধি অপেক্ষা করতে হবে।'

তিন মাসের মাথায় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। আবিষ্কার করি আমি সন্তানসম্ভবা হয়েছি। নিশ্চয় একটা ছোট্ট তুষার মানব আমার জঠরে বেড়ে উঠছে। এক আশ্চর্য অনুভূতিতে ভরে গেল মন এবং শরীর। সাউথ পোলে আসার পরে তুষার মানবের সাথে আমার দূরত্ব, আমার একাকিত্ব, সব কষ্ট ছাপিয়ে মাতৃত্বের আনন্দে ভরে উঠলোমন। মনে হলো আমার নারীজন্ম সার্থক হলো। এই প্রথম অনুভব করলাম জীবনে পূর্ণতা। অনুভব করলাম আমার জঠরের জল জমে বরফ হয়ে গেছে। আমার অনাগত সন্তান নিশ্চয় তার বাবার মতোই তুষার ধবল চোখ আর তুষার আস্তরণের আঙ্গুল নিয়েই জন্মাবে। আর একটা বদ্ধমূল ধারণা আমার মনে জন্মায় সেটা হলো আর কোনোদিন আমরা সাউথ পোল থেকে বাইরের পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারবো না। আমরা যেন অন্তহীন অতীতের মায়াজালে আটকা পড়ে গেছি, এই মায়াজাল থেকে আর কোনোদিন মুক্তি পাবো না। উষ্ণতা যেন দূর দিগন্তের সীমাহীনতায় লীন হয়ে আছে। মাঝে মাঝে মনে হয় উষ্ণতা নামের এক অনুভূতি কখনো ছিলোই না আমার জীবনে। জীবনের সব কিছু হারিয়ে গেলেও কান্নাটা হারিয়ে যায়নি। আবিষ্কার করলাম আমি কাঁদতে পারি। যখন আমি কান্না করি আমার স্বামী আমায় টেনে বুকে ধরে চুমু দেয়। চিবুকে গড়িয়ে পড়া অশ্রু ছুঁয়ে বরফ করে দেয় আবার ঠোঁট দিয়ে সেই জমাট অশ্রু মুছে দিয়ে বলে- 'ভালোবাসি তোমায়!' আমি জানি এটাই হলো আমার জীবনের চরমতম সত্য, আমার অতীত, আমার বর্তমান, আমার ভবিষ্যৎ। তুষার মানব আমাকে ভালোবাসে। ও যখন বলে 'ভালোবাসি' এই সুন্দরতম শব্দটা ঝড়ো বাতাসে সহস্র তুষারকণা হয়ে ছড়িয়ে পড়ে সাউথ পোলের হিমায়িত দিগদিগন্তে।

('মাই হাসব্যান্ড ইজ এন আইসম্যান' অবলম্বনে)
-হারুকি মুরাকামি
ভাষান্তর

তুমি দেখেছো কি?

আব্দুল্লাহ আল রানা ফরহাদ
প্রাক্তন ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

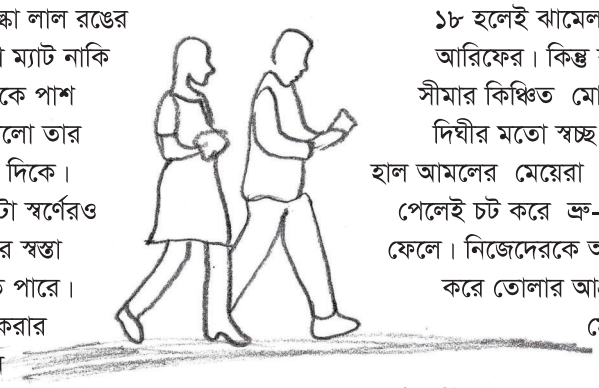

সীমার ঠোঁটে হাল্কা লাল রঙের লিপস্টিক। সেটা ম্যাট নাকি গ্লসি এই চিন্তাটাকে পাশ কাটিয়ে চোখ গেলো তার কানের ঝুমকোর দিকে। সোনালি রং, সেটা স্বর্ণেরও হতে পারে আবার স্বস্তা ইমিটেশনও হতে পারে। এই যুগে নকল করার কারিগরিরা এখন দক্ষতার তুঙ্গে। আর তাই চোখের দেখায় সিদ্ধান্ত নেয়াটা নেহাত বোকামি। সীমার লিপস্টিক আর ঝুমকোর মাঝে বিস্তৃত কপোলের ত্বকে বেশ রুক্ষতার আভাস। পারিবারিক অস্বচ্ছলতার বহিঃপ্রকাশই হবে কারণ এই বয়সের মেয়েরা যথেষ্ট চেহারা সচেতন। এদিকে শীতের শুষ্কতা পেরিয়ে ফাল্গুনের হাওয়া বইছে। মাঝে তো দিন দুয়েক দমকা হাওয়া আর ঝিরঝিরি বৃষ্টি হয়ে গেলো। প্রকৃতি আর মানুষ দুইই পাল্টাচ্ছে দ্রুত। সহজে হিসাব মেলা ভার। সীমার বয়সের হিসাবও মিলছে না। তার লিপস্টিকে ঢাকা ঠোঁট, ঝুমকোর ভারে কিঞ্চিত ঝুলে পড়া কানের লতি, আর কপোল ও হাতের ত্বকের রুক্ষতা বলে দেয় তার দাবিকৃত বয়স ১৯ বছর যথাযথই হতে পারে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিবেকআর আইন কানুন মিলিয়ে মেয়েটার বয়স ১৮ হলেই ঝামেলা চুকে যায় আরিফের। কিন্তু বাধ সাধছে সীমার কিঞ্চিত মোটা ভ্রু আর দিঘীর মতো স্বচ্ছ দুই চোখ। হাল আমলের মেয়েরা হাতে টাকা পেলেই চট করে ভ্রু-প্লাক করে ফেলে। নিজেদেরকে আবেদনময়ী করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টায় মেতে ওঠে। প্লাক করা ভ্রু, লিপস্টিক, চোখে মাসকারা আর কপোলে কিছুটা রুজ তো নিত্যতার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঠোঁটে হালকা লাল লিপস্টিক ছাড়া সীমার মাঝে বাকি গুলা অনুপস্থিত। তাছাড়া এ বয়সে মানুষের চোখে স্বচ্ছতা থাকে না। সীমা তার সাজগোজের পটুতায় চেহারায় ১৯ ফুটিয়ে তোলার যতই চেষ্টা করে থাকুক না কেন, মাঝখান দিয়ে গোল পাকিয়ে বসে আছে তার দুই চোখ।

আরিফের অনুসন্ধিৎসু অবলোকনের সামনে অস্বস্তি বোধ করা সীমাকে আরো কুঁকড়ে দিয়ে আরিফ বললো, হাত দুইটা মেলে ধরেন দেখি!

ব্যাপারটা মোটেও কনে দেখা নয়। তবু ভোরের বাতাসে তির তির করে কাঁপতে

থাকা ধান গাছের মতো হাত বাড়িয়ে দেয় সীমা। বাম হাতের আঙুলগুলোতে নারী সুলভ কিঞ্চিত বড় নখ, কিন্তু দশ আঙুলের প্রতি নখের আগা ক্ষয়ে যাওয়া। ঘরবাড়িতে কাজ করার আভাস। সেটা নিজের বাড়িতেই হবে নিশ্চিত কারণ যত অভাবই থাক এখনকার কম বয়েসি মেয়েরা চট করে অন্যের বাসায় ঝি-এর কাজ করে না।

সীমার অস্বস্তি যেন প্রবাহিত হলো আরিফের মনে। একটু গলা খাঁকারি দিয়ে জিজ্ঞাসা করলো-
- দেশের বাড়ি কোথায় আপনার?
- টাঙ্গাইল।

কিছুটা ধাক্কা খায় আরিফ। মনে মনে তার এবার অতীতে ফেরার পালা। চোখের সামনে ভেসে ওঠে মৃতপ্রায় নদী 'টোক', উজাড় প্রায় বন 'ঝরকা' আর বিলুপ্ত 'পদ্মবিল'। নিজের নয়, তবু খুব আপন এক শহর। কিন্তু মানুষের ছায়া সরে সরে যায়, কিছু টুকরো শব্দেরা গুঞ্জন তোলে আর কিছু সময় যেন থামিয়ে দেয় তার বর্তমান সময়। মানুষ কি চাইলেই সব পারে? চাইলেই কি ফেলে আসা যায় কোন সোনালি অতীত? কোন এক অসাড়তা ভর করে আরিফের উপড়। অথচ সে জানে সময় বয়ে যাচ্ছে। সামনে অনিশ্চয়তার দোলাচলে মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে। আর তার দিকে তাকিয়ে আছে অনেক জোড়া কৌতূহলী চোখ। কিন্তু চোখ পড়ে আবার সীমার চোখে। সীমার চোখ প্রবল অনিশ্চয়তার আশঙ্কায় টলোমলো।

জড়তা কাটিয়ে ফের প্রশ্ন,
- পড়াশোনা করেছেন কোন পর্যন্ত?
- এসএসসি পাশ করেছি।
শীতল একটা স্রোত আরিফের মেরুদন্ড দিয়ে প্রবাহিত হওয়া শুরু করে এবার। এসএসসি নাকি এইচএসসি শুনলো সে? এইচএসসি বোধহয়। নিশ্চিত হতে চায় সে।
- মেট্রিক নাকি ইন্টারমিডিয়েট?
- এসএসসি মানে মেট্রিক।

নিজেকে যথাযথ শান্ত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যায় আরিফ,
- তো কবে পাশ করছেন?

বিধাতার কাছে কোন মানুষ এভাবে যেন আয়ু ভিক্ষা চায়নি, যেভাবে আরিফ মনে মনে কাঙ্ক্ষিত উত্তর আশা করছে। কিন্তু তার সব আশঙ্কাকে সত্য প্রমাণিত করে জবাব দেয় সীমা,
- গত বছর।

আরিফ জানে তার ঝামেলার কফিনে শেষ পেরেকটা ঠুকে দিয়েছে মেয়েটা। তবু শেষ বলে কি আসলেই কিছু আছে? বুক ভরে নিঃশ্বাস নেয় আরিফ, নিজেকে বোঝায় সম্ভাবনা এখনো শেষ হয়ে যায়নি। চকিতে ফের প্রশ্ন
- তা কোন ক্লাসে কয়বার ফেল করছেন?

প্রশ্ন করে কিছুটা হাসার চেষ্টা করে সে, কিন্তু ভ্যাবলার মতো ঝুলে যায় হাসিটা, আর কিছুটা রেগে ওঠে যেন সীমা। ঠোঁটের হালকা লাল রংয়ের আভা তার মুখ চোখ ছাপিয়ে ঝরে পরে কথায়, -ফেল করুম

ক্যান? মাঝে দুই বছর পড়ালেখা বন্ধ আছিলো।

তীরে পৌঁছতে পৌঁছতেও তরী যেন ডুবে যায় আরিফের। মাত্র দুই বছর! এর বেশি না কেন? এই দুই বছর দিয়েও যে সীমার বয়সের অংক ১৮তে মেলে না। সব কিছু সেই ঘুরে ফিরে সীমার কিশোরী চোখের দাবী মেনে নিয়ে বসে আছে। সে কি মেয়েটার দাঁত দেখতে চাইবে? কিন্তু তাতে কি সব কিছু প্রমাণ হয়? হয় না।

এদিকে ঘামে ভিজে উঠেছে আরিফের শার্ট। মাথার উপর ফ্যান নয় যেন ফ্যানের নিচে তার মাথাটাই বন বন ঘুরছে।

- আচ্ছা, সীমা, আমাকে একটু সময় দেন। আপনি একটু বসেন।

এই বলে আরিফ ডেকে নেয় তার এইচআর অফিসারকে।
- দেখি সীমার ফাইলটা।

ফাইল ঘেটে জন্মনিবন্ধনের কাগজে লেখা দেখে জন্মসাল ২০০১ কিন্তু এসএসসি-এর কাগজে ২০০৩। মূল ক্যাচালটা এখানেই। এদিকে জন্ম নিবন্ধন করা হয়েছে ২০১৩ সালে। আরিফ এক নজরেই বুঝে যায় যে জন্ম নিবন্ধন কাগজটি নকল আর নকল করার কারগরি এখন দক্ষতার তুঙ্গে। ইশ! যদি অনলাইন ভেরিফিকেশন না থাকতো তবে এ যাত্রাতে কিছুই হত না।

- আচ্ছা, মেডিকেল থেকে কি সীমার বয়স প্রমাণের যথার্থতা আছে?
- হ্যাঁ ভাইয়া আছে। উত্তর দেয় এইচ আর অফিসার।
- আচ্ছা, সীমাকে একটু পাঠান।
পুণরায় সীমা এসে দাঁড়ায় আরিফের সামনে।
- সীমা, পরিবারে কে কে আছে?
- মা আছে, তয় অসুস্থ।
- আর কেউ নাই?
- আর বড় বোন আছে। কাজ করতো একটা গার্মেন্টসে। দুই মাস কোন খোঁজ নাই।
- বাবা নাই?
- বাবা মরছেন প্রায় তিন বছর।
- ভাই নাই কোন?
- দুই ভাই আছে কিন্তু দেখে না।

সংসার চলে কেমনে? প্রশ্নটা করেই মনে মনে নিজেকে রামছাগল বলে গালি দেয় আরিফ। ভেবেছিলো সীমা কোন উত্তর দিবে না। কিন্তু তাকে বেশ অবাক করে দিয়েই আশ্চর্য দৃঢ়তায় উত্তর দেয় সীমা,

- চলে না বলেই তো কাজ করতে আইছি। ঘরভাড়া বাকি, মা-এর জন্য মেলা টাকার ওষুধ লাগে প্রতিদিন।

আরিফ অবাক হয়ে দেখে যে মেয়েটা শুধুমাত্র সমস্যার কথা বলছে কিন্তু কাঁদছে না। সাধারণত এমন সমস্যায় মেয়েরা এসে কেঁদে কেটে অস্থির করে তোলে।

- আচ্ছা সীমা, যান লাইনে যেয়ে কাজ করেন। চুলে তেল দিবেন কম, পারলে ভ্রু প্লাক করবেন আর একটা চশমা পরবেন এখন থেকে।

আরিফ জানে তাকে কী করতে হবে এখন। সীমার ফাইল থেকে এসএসসি পাশের সার্টিফিকেটটা ফেলে দেয় আরিফ। সে জানে, এই কাগজ নিয়ে কোন কমপ্লায়েন্ট ফ্যাক্টরিতে কাজ পাবে না মেয়েটা। কাজ পেলেও পাবে হয়তো বাজে পরিবেশের কোন ফ্যাক্টরিতে অথবা অন্য কোথাও, অন্য কোনখানে... যা ভাবতে চায় না সে।

তিন মাস পর...

গতকাল এক বায়ারের অডিট ছিলো আরিফদের ফ্যাক্টরিতে। আরিফের নেয়া ব্যবস্থাতেও বয়স ঢাকতে পারেনি সীমা। চোখের স্বচ্ছতা আর হাসি থেকে কৈশোরের স্নিগ্ধতা লুকাতে পারেনি মেয়েটা। ঝানু অডিটরের চোখ ফাঁকি দিতে পারে না কিছুই। 'শিশু শ্রমিক' নিয়োগ ভয়ঙ্কর অপরাধ। মোবাইলে বিডি জবস ঘাটতে ঘাটতে ফ্যাক্টরি গেট দিয়ে বের হচ্ছে আরিফ আর মায়ের ঔষধের দাম আর ছোট্ট হ্যান্ড ব্যাগের টাকার হিসাব মেলাতে মেলাতে বের হচ্ছে সীমা। গেটের বাইরে এসে পরস্পরের চোখে চোখ পড়ে তাদের।

ভাইয়া, চা খাইবেন এক কাপ? আমি খাওয়ামু কিন্তু...

ভয়

মনিরুল হাসান মিঠু
জিএম, মার্কেটিং অ্যান্ড মার্চেন্ডাইজিং
ব্যাবিলন গ্রুপ

আমাদের ছোটবেলায় মফস্বল শহরগুলোতে সন্ধ্যার পরে বেশ নীরব হয়ে যেতো। এমনিতেও লোকবসতি কম ছিল এবং সন্ধ্যা নামার পর ছোটোছোটো সড়কগুলোতে লোক চলাচল বেশ কমে যেতো। সড়কবাতি হিসেবে জ্বলতো টাংস্টেন বাল্ব, যার আলো একটু দূরে গেলেই ম্লান হয়ে যেতো। আবার মাঝেমাঝে বৈদ্যুতিক খুঁটির বাতি বিকল হয়ে অন্ধকার হয়ে যেতো কিছুটা পথ। সাধারণত সড়কের পাশে প্রায় প্রতিটি বাড়ির সামনে একটি ছোট ফুলের বাগান বা সবজি বাগান করা হতো। তাই সড়কের দুই পাশ বেশ ফাঁকাই হতো। শহরের মোড়ে মোড়ে আজকালকার মতো ঘন ঘন দোকানপাট দেখা যেতো না, এমনকি চায়ের দোকানের আড্ডাও হতো না বললেই চলে। সন্ধ্যা নামলেই স্কুল ও কলেজ পড়ুয়ারা পড়াশোনায় মনোযোগী হতে ব্যস্ত হতো। মায়েরা ব্যস্ত হতেন রান্নায় কারণ খাবার গরম রাখার বাক্স তখনও দেখিইনি তাই মোটামুটি তিন বেলাতেই নতুন রান্না করা খাবার খেতে পাওয়া যেতো। সে সময় বাবারা তাদের কোনও বন্ধুর বাসায় আড্ডায় মজে যেতেন। যখনকার কথা বলছি তখন ঘরে ঘরে টেলিভিশন ছিলো না। ফলে এ সব আড্ডা টেলিভিশনওয়ালাদের বাসাতেই বেশি হতো।

সেই সময় আমার বাবার চাকরির সুবাদে আমরা থাকতাম বরিশাল জেলার ঝালকাঠি উপজেলাতে। আমি পড়তাম ঝালকাঠি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে। সুগন্ধা নদীর তীরে ছিল আমাদের স্কুলের বিশাল মাঠ।

হেমন্তের এক বিকেলে বাসায় রাতের রান্নার জন্য আমিষের টান পড়াতে মা বললেন কাছেই মোড়ের বাজার থেকে কিছু মাছ কিনে আনতে। এমন কোনও দূর নয়, হেঁটেই যাওয়া যায়।

বলে রাখা ভালো ঝালকাঠি বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের একটি জোয়ার-ভাটা প্রবণ এলাকার জেলা শহর, তৎকালীন উপজেলা শহর। এই শহরটাতে জালের মতো বিছিয়ে রয়েছে সরু ও মোটা অসংখ্য খাল। জোয়ারের সময় এই খালগুলোতে পানি এসে ভরে যায় আর ভাটার সময় শুকিয়ে যায়। দিনে দুইবার জোয়ার-ভাটা হয়, পূর্ণিমা এবং অমাবশ্যার সময় পানির পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়। অনেক বছর পরে যখন নেদারল্যান্ডস এ যাই তখন সেই দেশটার সাথে আমার প্রিয় ঝালকাঠির তুলনা করেছি। নেদারল্যান্ডস এর খালগুলোতে জোয়ার-ভাটা হয় কি না কিংবা কেউ বড়শি বা জাল ফেলে মাছ ধরে কি না তা দেখা হয়নি, তবে সেই সময় ঝালকাঠির খালগুলোতে তা প্রায়ই দেখা যেতো। শৌখিন মাছ শিকারিরা মাছ ধরতো ও কেউ কেউ তা পরে মোড়ের বাজারে বিক্রি করে দিতো। কেউ বড়োসড়ো একটা গলদা চিংড়ি ধরতে পারলে সেদিনের জন্য ভালো একটা উপার্জন তার হয়ে যেতো। কারণ ওই মাছ রপ্তানিকারকদের কাছে চড়া দামে বিক্রি করতে পারতো সেই মাছ শিকারি।

মায়ের নির্দেশে সেই দিন আমি একটি চটের থলে হাতে করে মাছ বাজারের উদ্দেশে পায়ে হেঁটে রওনা হয়ে গেলাম। সময়টা শেষ বিকেল। সেই সব দিনে আমাদের মতো ছোটোদের মাগরিবের আজানের মধ্যে ঘরে ফেরার একটি কড়া নিয়ম চালু ছিলো। সেই কথা মাথায় রেখে আমি বেশ দ্রুততার সাথে হাঁটছিলাম। রিকশা পাওয়া যেতো, তবে সাধারণত দশ-কুড়ি মিনিটের হাঁটা পথে আমরা রিকশা নিতাম না। হেঁটে হেঁটে বাজারের কাছে আসতেই দূরের এক মসজিদ থেকে আজানের ধ্বনি শুনতে পেলাম। মনে এক প্রকার অস্বস্তি তৈরি হলো – মাছ কিনে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হয়ে যাবে এবং মাছ নিয়ে একাই বাড়ি ফিরতে হবে।

ওই দিন বাজারে মাছ এসেছিলো বেশ, দরদাম করে সস্তায় ভালো মাছ কিনে মনটা আমার ভারি খুশি। এবার বাড়ি ফেরার পালা, তবে হাতে পয়সা আর কিছু অবশিষ্ট নেই যে একটি রিকশা নেবো। জোরে হাঁটতে শুরু করলাম। মোটামুটি সোজা রাস্তা, তবে রাস্তার দুপাশে প্রচুর গাছপালা মাথার ওপর ছাতা তুলে রেখেছে। বাজার থেকে বাড়ি ফেরার দূরত্বের মাঝামাঝি ছিলো একটি অফিসার্স কলোনি, তার গেট ও দু'তিনখানা দোকান। তারপর কিছুটা ফাঁকা রাস্তা, পরে একটা শান বাঁধানো মঞ্চ মতো। এই মঞ্চে ছিলো ঝাঁকড়া এক তুলসী গাছ এবং চারিদিকে বেশ কিছু সুপারি গাছ। ঠিক যেন থান্ডার ক্যাট্স কার্টুন ছবির 'মামরা' এর পিরামিড এর মতো। ওখানে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা পুজো করতো। সবাই ওই জায়গাটাকে কালীখোলা বলেই চিনত। আমি বেশ জোরেই হাঁটছিলাম, কিন্তু পথ যেন ফুরাচ্ছিলোই না। অল্প পরে অফিসার্স কলোনির গেট পার হলাম, মনে হলো কাছের দোকানগুলোতে আজ মানুষজন খুব কম। সড়কবাতিগুলো আলো ঠিকই দিচ্ছিলো, তবে হালকা কুয়াশার সাথে আশেপাশের বাড়ির রান্নাঘরের ধোঁয়া এসে

মিলে মিশে কেমন একটা অস্পষ্টতার জন্ম দিচ্ছিলো। আকাশে চাঁদের আলো বাড়ছিলো একটু একটু করে, মনে হয় পূর্ণিমাই ছিল সেদিন, চাঁদের উজ্জ্বল আলোতে ভেসে যাচ্ছিল চারপাশ। সেই রূপালি আলো কুয়াশার সাথে মিলে মিশে এক ধরনের মায়াবী পরিবেশ তৈরি করছিলো। আর অল্প একটু হাঁটলেই আমাদের বাসা ও আমার বাবার অফিস কমপ্লেক্স। কিন্তু মাছের থলে হাতে করে এখন আমাকে সেই কালীখোলা পার হয়ে যেতে হবে ভেবেই কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছিল। সেই দিকে তাকাতেই আমার চোখদুটো আটকে গেলো একটা দৃশ্যের দিকে – মুহূর্তে মনে হলো আমার পা আর চলছে না, আটকে যাচ্ছে রাস্তার সাথে। কিন্তু বাসায় তো আমাকে যেতেই হবে, অদম্য মনের জোরে আরও কয়েক কদম এগোলাম। নাহ্ শরীর বিদ্রোহ করছে, পা এগুতে চাইছে না। দোয়া-দরূদ পড়তে শুরু করলাম, ভালো করে তাকালাম আবার। কিন্তু দৃশ্যপটের কোনও পরিবর্তন হলো না। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম কেউ একজন সাদা কাপড়ে ঘোমটা দিয়ে বসে আছে কালীখোলার মঞ্চটার উপর। ছিটকে পিছিয়ে এলাম কলোনির গেট বা দোকানগুলোর কাছে। সন্ধ্যায় পড়ার সময় দোকানে ছোটোদের আনাগোনা সে সময়ে মোটামুটি নিষিদ্ধই ছিল তাই দোকানগুলোর উল্টাপাশে গেট বরাবর দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার মাথায় তখন একটাই চিন্তা অন্য কোনও মানুষ পেলে তার সাথে হাঁটবো আবার। পুরো ব্যাপারটাতে সময় লেগেছে হয়তো দুই কী তিন মিনিট কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে যেন একটা অনন্তকাল কেটে গেছে। একবার মনে হচ্ছিলো মাছ ফেলে দিয়ে দৌড় লাগাই, কিন্তু মা'কে গিয়ে কী বলবো।

একটু পরে একটা রিকশা দেখতে পেলাম, মনে একটু আশা জাগলো। দেখলাম দুজন অপরিচিত আরোহী নিয়ে রিকশাটা আমি যেদিকে যাবো সেদিকেই যাচ্ছে। রিকশাটার নিচে একটা হারিকেনও জ্বলছে, এটা দেখে আমার মন হতে ভয়টা একটু কমতে লাগল। কারণ আমি শুনেছি ভূতপ্রেত আগুনের কাছে আসে না, তাই আমি আর সাতপাঁচ না ভেবে রিকশার পেছনে ছুটতে লাগলাম। উদ্দেশ্য একটাই, এই রিকশার পেছনে ছুটে কালীখোলা পার হয়ে বাসায় পৌঁছে যাবো। হৃৎপিণ্ড যেন বুকের খাঁচার সাথে স্কুলের ব্যান্ডের মতো অবিরাম বাড়ি খেয়ে চলেছে। কারণ দুটো – ভয়াতঙ্ক ও রিকশার পেছনে ছোটা। রিকশার পেছনে বালকের ছোটা কোনও অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিলো না। আরোহী লোকদুটো তাই কিছু মনে করেনি। আমি রিকশার বাম পাশের চাকা বরাবর ছুটছিলাম যাতে করে আমার ও কালীখোলার মাঝে রিকশাটা থাকে। কাছাকাছি চলে এলে আমি চোখ বন্ধ করে ফেলেছি এবং দোয়া পড়তে শুরু করেছি। আরেকবার তাকিয়ে দেখবার এক অদম্য কৌতূহল কষ্টে চেপে রাখছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কৌতূহলের কাছে ভয় পরাস্ত হলো। কালীখোলা যখন পার হচ্ছি ঠিক তখন চোখ খুলে ঘাড় ঘুড়িয়ে তাকালাম আমি। এতো কাছে থেকে ভূত বা পেত্নিটিকে দেখে মুহূর্তে আমার হাসি পেয়ে গেলো। দূর থেকে দেখা চাদর মুড়ি দেওয়া

মানুষের আকারটি বদলে গিয়ে সেটি সব সময় যা দেখি তাই হয়ে গেছে – হিন্দুদের পবিত্র তুলসীর ঝোপটিকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই কিন্তু একটি সুপারি গাছের খোল তার উপরে অদ্ভুত একটি অবয়ব তৈরি করেছে বেশ নিপুণভাবেই। তখন মনে হলো রিকশার পেছনে ছোটাটা কী বোকামিই না হয়েছে।

জীর্ণ শহরের, জীর্ণ ছাতা

সানজিদা আফরোজ তিথি
প্রাক্তন জুনিয়র ওয়েলফেয়ার অফিসার, এইচআর অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স
অবনী ফ্যাশন্স লিমিটেড

১

দুপুরবেলা হুট করেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলো। মেয়েটা ফুটপাতের উপর একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। ভিজে চুপসে গেছে একদম। মিনিট পাঁচেক পর সামনে একটা রিকশা এসে থামল। ভাড়া মিটিয়ে একটা ছেলে নেমে এসে মেয়েটির পাশে এসে দাঁড়ালো। এই মেয়েটিকে আমি আগেও দেখেছি বেশ কয়েকবার। প্রথম প্রথম দুজন একসাথে বসতো, গল্প করতো, হাঁটতো, রিকশা করে ঘুরে বেড়াতো; আরো নানান কিছু। ভারি মিষ্টি লাগতো আমার! তখন মনে হতো, আজকে যেন আকাশটা একটু মেঘলা থাকে, একটু যেন বৃষ্টি হয়! তাহলে ছেলেটি আমাকে সাথে নিয়ে বের হবে। দারুণ মিষ্টি, সুন্দর সময় কাটবে আমার।
আজকাল আর তেমন মনে হয় না। দুজন কেমন যেন একটু এলোমেলো আর অগোছালো ভাবে কথা বলে। সে কারণে আমারও তেমন ইচ্ছা করে না ওদের কথোপকথনের শ্রোতা হতে। এক রকম বাধ্য হয়েই শুনতে হয় আর কি। এই যেমন আজকের কথাই ধরা যাক, ছেলেটি পাশে এসে দাঁড়ানোর পরেও মেয়েটি অনেকক্ষণ চুপ। ছেলেটিই প্রথম বরফ গলালো-

- কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছো?
- জানি না।
- বৃষ্টিতে তো ভিজে গেছো একদম!
- তো? তাতে তোমার কিছু আসে-যায় বলে তো মনে হয় না।

- ইচ্ছা করে দেরি করেছি, এমন তো না। বৃষ্টিতে ঢাকা শহরে সহজে যে রিকশা পাওয়া যায় না সেটা তো তুমিও জানো। অযথা রাগের তো কোন কারণ দেখি না।

- হ্যাঁ, আমি মানুষটাই তো অযথা।
- আমি কিন্তু সেরকম কিছু বলি নাই। থাক, বাদ দাও। কী তোমার জরুরি কথা বলো।

- এখানে, এভাবে?
- আচ্ছা, চলো বসছি কোথাও।
ছেলেটি আমাকে মেলে ধরলো। আমার

বয়স হয়েছে। দেখতেও আর আগের মতো চকচকে নই। জায়গায় জায়গায় মরিচা আর দুর্বলতার ছাপ। মেয়েটি আর ছেলেটি এখন একসাথে পাশাপাশি হাঁটছে, কিন্তু কেউ কোন কথা বলছে না। আগে এরকম বৃষ্টির দিনে আমি সাথে থাকলেও ওরা আমাকে পাত্তা না দিয়ে হাতে বা কোন ব্যাগের ভেতর রেখে দিতো। ভাবতো আমি নেই। রাস্তায় হাঁটতো, গান গাইতো, ভিজতো। আহা! কী সব দিন যে ছিলো ওদের!

হাঁটতে হাঁটতে ওরা একটা ছোট্ট কফি শপের সামনে চলে আসে। আমাকে বন্ধ করে ভিতরে ঢুকলো, দুজন মিলে একটা টেবিলে বসলো।

- বলো এবার, কী জরুরি কথা?
- আমার স্কলারশিপটা কনফার্ম হয়ে গেছে। ফুল পেইড।
- বাহ! এটাতো খুবই ভালো খবর।
- হু, হয়তো। ভিসাও পেয়ে গেছি।
- ওহ!
- শুধু ওহ? আমরা দুজন একসাথে যেতে চেয়েছিলাম।
- চেয়েছিলাম, কিন্তু হয় নি।

- তুমি আসলে চাও ই নাই। চেষ্টাই করো নাই কখনো। একটা সম্পর্ক তো এমনি এমনি বাঁচে না। দেশের ভেতরেও একটা চাকরি পেয়ে বলতে পারোনি, 'চল আমরা বিয়েটা করেই ফেলি।' আমারও তো নিজের স্বপ্ন আছে, ক্যারিয়ার আছে। আর কত অপেক্ষা করা সম্ভব?
- কেন? তুমি কি ফিরবে না আর?
- আমি জানি না। সাতটা বছর পার হলো! কিসের আশায় ফিরবো? অনেক বার তোমাকে অনুরোধ করেছি, বুঝিয়েছি। আমার পরিবারের সাথে একসাথে বসেও কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি। তোমার ওই এক কথা, 'আমার আরো সময় লাগবে।' আর কত সময় দিলে ওই সময়টা আসবে সেটা কি তুমি নির্দিষ্ট করে বলতে পারো?

- না, পারি না। কিন্তু তুমি কি আমাকে বুঝেছো? এই গতানুগতিক পড়াশোনা, চাকরি, রুটিন জীবন এসব আমার পছন্দ না। তাছাড়া এই মুহূর্তে বিয়ের কথা ভাবা সম্ভব না।

- তুমি তো এমন ছিলে না।
- বদলানো যাবে না, এরকম নিয়ম কোথায় লেখা আছে?

- ঠিকাছে, তাহলে আজকেই সব হিসেব বদলে যাক। দু সপ্তাহ পরে আমার ফ্লাইট। তোমার বাউন্ডুলে জীবনে ঝুলে থাকার আর কোন ইচ্ছা আমার নেই।

মেয়েটি কফি শেষ না করেই, টেবিলে বিল রেখে চলে গেলো। ছেলেটি কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলো। কফির মগ থেকে আর ধোঁয়া উঠছে না।

আমাকে সাথে নিতে ভুলে গেছে ছেলেটি। বাইরেও বৃষ্টি ছিলো না তখন। এভাবেই অনেক কিছু ভুলে যায় সে, ভুলে যেতে হয়।

২

কফি শপের টেবিল পরিষ্কার করতে গিয়ে আমাকে দেখে ওই শপেরই একজন। একটু আগে উনিই দুটো কফির মগ টেবিলে দিয়ে গিয়েছিলেন। ফেরত নিতে এসে একদম অপরিবর্তিত দুটো কফির মগ পেলেন। টাকা দিয়ে কিনে কেন যে মানুষ খাওয়ার জিনিস নষ্ট করে সেটা ভেবেই তিনি হয়তো কিছুটা বিমর্ষ। তাই হয়তো পেছন থেকে এসে যে একজন দাঁড়িয়ে আছে সেটা টেরই পাননি।

কী ব্যাপার তাহের সাহেব? একটা টেবিল ক্লিন করতে এতোটা সময় নিলে চলবে? সার্ভিস এরকম হলে ক্যাফে চলবে? হাতটা একটু চালান।

- সরি স্যার।

- আপনি যাওয়ার আগে ম্যানেজার স্যারের সাথে একবার কথা বলে যাবেন। উনি নিজে ডেকেছেন।

- আচ্ছা।

তাহের নামের ভদ্রলোকটি টেবিলটা ভালো করে মুছে যাওয়ার সময় আমাকে সাথে নিয়ে গেলেন। নিজের কাউন্টারে আমাকে রেখে দিলেন। হয়তো ভেবেছিলেন কেউ এসে নিয়ে যাবে পরে। বিকাল থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে রাত হয়ে গেলো। কিছুক্ষণ আগে আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ঘড়িতে রাত দশটা। উনি সম্ভবত এখন ম্যানেজারের সাথে কথা বলতে যাবেন।

- স্যার, আমাকে দেখা করতে বলেছিলেন?

- হ্যাঁ। তাহের ভাই, আপনি অনেকদিন ধরে আমাদের সাথে আছেন। আপনার কাজ নিয়ে আমাদের তেমন কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু, বয়স তো অনেক হলো। শরীর এক সময় তার কাজের গতি কমিয়ে দেয়। বয়সের তেজ তো আর সব সময় থাকে না! তাছাড়া, আসলে, কীভাবে যে বলি! করোনার ধাক্কাটা ক্যাফে এখনো সামাল দিয়ে উঠতে পারে নাই। মেইন্টেন্যান্সের খরচটাও বাড়ছে প্রতিদিন। এই অবস্থায় আসলে মালিক পক্ষ দুয়েক জন কে বাদ দিতে বলছে। আপনার বয়স, শারীরিক দুর্বলতা বিবেচনায় আপনার নামটাই আগে আসছে। বোঝেনই তো, এখন ইয়াং পোলাপানের সময় যাচ্ছে।

- জি স্যার, বুঝতে পারছি।

- আপনি জ্ঞান বুদ্ধিয়ালা মানুষ। বুঝবেন জানতাম। এই মাসটা কাজ করেন। সামনের মাস থেকে বিশ্রাম নেন।

- আচ্ছা।

বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। এক রকম বাধ্য হয়েই আমাকে হাতে নিলেন তাহের সাহেব। খুলে নিয়ে বাস স্টপের দিকে হাঁটা শুরু করলেন। উনার সাথে আমার নিজের একটা মিল পেলাম- উনি বয়স্ক, জীর্ণ, আমিও তাই। যাই হোক, উনার মাথার উপর আমি থাকার পরেও মনে হচ্ছে কিছু নাই, মুখটা অসহায় লাগছে দেখে। হয়তো ভাবছেন- সংসার, সময়, জীবন-যাপন,

প্রতিটা ধাপ কী ভীষণ কঠিন। হয়তো বড় পরিবারের খরচের কথা ভাবছেন। হয়তো নতুন আরেকটা সংগ্রাম শুরু হবে, সেটা ভাবছেন। ভদ্রলোক চুপ করে আছেন, মনের কথা বোঝার সাধ্য তো আমার নাই! চারপাশে যা ঘটে তাই দেখি, চারপাশে যা শোনা যায় তাই-ই শুনি। হাঁটতে হাঁটতে উনি বাস স্টপে দাঁড়ালেন। মিনিট দুয়েক দাঁড়ানোর পর একটা বাসে চেপে বসলেন। কপাল থেকে চিন্তার ভাঁজটা যাচ্ছে না। আমি ভেজা বলে আমাকে বাসের জানালার সাথে ঝুলিয়ে দিলেন।

যা ভেবেছিলাম তাই হলো। চিন্তার প্রকোপে তাহের সাহেব আমাকে না নিয়েই বাস থেকে নেমে গেলেন।

এই শহরের একটা দোকান থেকে যিনি আমাকে প্রথম কিনে এই শহরে ব্যবহার শুরু করলেন, সেদিন থেকেই আমার গল্প শুরু। অভিজ্ঞতা তো কম হলো না।

আমি জানি আবার কেউ আমায় পাবে, নতুন গল্প শুরু হবে। কারণ, হারানোই মানুষের স্বভাব, আগলে রাখা নয়।

নারী জাগরণ

মো. সোহেল রানা
সিনিয়র সুপারভাইজার, ফিনিশিং
ব্যাবিলন প্রিন্টার্স লিমিটেড

হে নারী তুমি উঠিয়াছ জাগিয়া
সমান্তরালে পুরুষের সমকক্ষ হইয়া,
হে নারী তুমি উঠিয়াছ জাগিয়া
মাদার তেরেসা রূপে মায়াবিনী হইয়া।

হে নারী তুমি উঠিয়াছ জাগিয়া
মাতৃরূপে বটবৃক্ষ হইয়া,
হে নারী তুমি উঠিয়াছ জাগিয়া
মানচিত্রের বুকে দেশ রক্ষার্থে,
হাতে হাত রেখে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে।

হে নারী তুমি উঠিয়াছ জাগিয়া
সংসার যুদ্ধে নিজেকে সমকক্ষ করিয়া,
হে নারী তুমি উঠিয়াছ জাগিয়া
আকাশের বুকে নক্ষত্র রূপে,
বিমানের চালক হইয়া,

হে নারী তুমি উঠিয়াছ জাগিয়া
দেশ চালনার প্রধান কাণ্ডারি হইয়া।

সোনার দেশ

শেখ মৃণ্ময় জামান
অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, এইচআর অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স
অবনী টেক্সটাইলস লিমিটেড

এইখানেতে আছে অনেক ফুল, পাখি আর ফসল বেশ,
এই আমাদের সোনার বাংলা
এইতো মোদের বাংলাদেশ।
পাখির মধুর কলরব আর ফুলের মিষ্টি গন্ধে,
মনটি আমার নেচে ওঠে ছন্দে আর আনন্দে।
নদীর মিষ্টি কলতান আর কৃষকের মুখের সুর,
আমার কাছে লাগে যেন ফুলের চেয়েও সুমধুর।

এইখানেতে আছে অনেক ফুল, পাখি আর ফসল বেশ,
এই আমাদের সোনার বাংলা
এইতো মোদের বাংলাদেশ।
ভোরবেলাতে রোদ ওঠে, বিকেলবেলা ছায়া,
অপরূপ এই দেশ দেখে আমার লাগে মায়া।
মাঝি ভাইদের নৌকা বাওয়া রাখালের মিষ্টি বাঁশি,
তাইতো মোরা এই দেশকে এত ভালোবাসি।
বাংলাদেশের শ্যামল শোভা মনকে আকুল করে,
তাইতো মোরা বেঁচে আছি এই ধরণির পরে।

এইখানেতে আছে অনেক ফুল, পাখি আর ফসল বেশ,
এই আমাদের সোনার বাংলা
এইতো মোদের বাংলাদেশ।

আমার প্রিয় নড়াইল

নাছিমা খানম
অপারেটর, সুইং
ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার লিমিটেড

ঢাকা থেকে বাসে উঠে
শান্ত হয়ে রই।
জানলা দিয়ে উঁকি মারি
নড়াইল কই!
ঐ দেখা যায় সাভার
সামনে ধামরাই
হেলপার কে ডেকে বলি
ফেরি কিন্তু ধরা চাই।
সামনে আছে মানিকগঞ্জ,
পদ্মা নদীর আগে,
পদ্মা নদী পার হইতে
মিষ্টি বাতাস লাগে।
নড়ালইকে রাখি মনে
থাকি যত দূরে,
আমাদের বাস পৌঁছে গেল
প্রিয় ফরিদপুরে।
জানলা দিয়ে চেয়ে দেখি
কত রঙের ফুল
দেখতে দেখতে পৌঁছালো বাস
কাশিয়ানী, মুকসুদপুর।
বাসে বসে কবি মনে
কত কি যে ভাবনা
জানলা দিয়ে চেয়ে দেখি
চলে এসেছি কালনা।
মধুমতী নদীর তীরে
নৌকা বাঁধা সারি সারি
ফেরি আছে দুই তিনটা
তবুও আমরা জ্যামে পড়ি।
রাস্তার সাইনবোর্ড জানান দিলো,
নড়াইল বাকি এক কিলো।
খুশির মাত্রা বেড়ে গেল,
প্রিয় নড়াইল চলে এলো।

এক ভিন্ন সংস্কৃতির গল্প

সুবন পাথাং
জুনিয়র অফিসার, এইচআর অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স
ব্যাবিলন গ্রুপ

সময়টা শীতকাল। কথায় আছে, শীতে কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমানোর আনন্দ আর অন্য কোনও ঋতুতে পাওয়া যায় না। যদিও ঢাকায় তেমন শীত পরে না। কিন্তু সেইবার ভালোই ঠান্ডা পড়েছিলো। পুরো ঢাকা জুড়ে কুয়াশা এমনভাবে হানা দিয়েছিলো যে পাশের দু'তলা ভবনটিও পরিষ্কারভাবে চোখে দেখা যাচ্ছিলো না। ঋতুর মধ্যে শীতকালই আমার সবচেয়ে পছন্দের। তবে দারিদ্র্যের জন্য এই সময়টা মোটেও আনন্দদায়ক নয়।

খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের বেশিরভাগই এই সময়টাতে (ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি) উৎসবমুখর দিন কাটান। আর তাদের মধ্যে আমরা যারা গারো, তাদের এই সময় নিজ নিজ বাসগৃহে অর্থাৎ গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার একটা তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়। বেশিরভাগই যায় ভাড়া করা বাসে। তাই আগে থেকেই বাস টিকিট কেনারও একটা রেশ শুরু হয়ে যায়। কেননা, পুরো বাস জুড়ে তখন শুধু আমাদের চেনা জানা যাত্রীরাই উঠবে। বছরের একটা সময় সকলের সাথে গ্রামে যাওয়ার অনুভূতিই আলাদা। পরের দিন গ্রামের বাড়িতে যাবো জানলে সেদিন রাতে আর ঘুম চোখের আশ পাশ দিয়েও উঁকি দিতে চায় না। বিছানার এপাশ হই বা ওপাশই হই, সেদিন আর আমার ঘুমের দেশে পাড়ি জমানো হবে না। অতঃপর ঘুমহীন রাত্রি যাপন করতে হয়। তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, সকাল হতে না হতেই ভোরবেলাতেই শুরু হয়ে যায় যত রকম প্রস্তুতি। মায়ের খাবার প্রস্তুত করা থেকে শুরু করে নিজেদের পরিধানাদি গোছানো, সবই সেই কিছুক্ষণের ভিতরই হতে হবে। না হলে বাস রেখে চলে যাওয়ার একটা আশংকা থেকেই যায়। আগেই বলেছি যে ভাড়া বাসে সব আমাদের পরিচিত লোক থাকবে। যার হেতু আমাদের তাড়াহুড়ো করা। অন্যথায়, পরিচিত জনেদের সাথে সমস্ত গল্পের পরিকল্পনা যে মাঠে মারা যাবে তা বলাই বাহুল্য।

আমার পরিবার থেকে স্ব-উদ্যোগে এই সময় শীত বস্ত্র বিতরণও করা হয়ে থাকে। যা আমাদের সাথে করেই গ্রামে নিয়ে যেতে হয়।

বাসে ওঠার আগে সে আরেক কাণ্ড। বাস ছাড়বে সকাল ৬ ঘটিকায় কিন্তু যাত্রী আসে সকাল ৬:৩০-৭:০০ ঘটিকায়। তখন সকলে ব্যস্ত হয়ে ওঠে তাদের নিজ নিজ লোকেদেরকে এইটুকু বার্তা পাঠানোর জন্য যে বাস ছেড়ে দিচ্ছে তোমরা যথাসম্ভব চলে এসো। যতক্ষণ না বাসে যাত্রী আসছে সকলে কুশল বিনিময়েই ব্যস্ত থাকে বেশি। এর মধ্যে কারোও আবার অনেকদিন পর দেখা হয়। আর এতদিন পর দেখা হলে তো বুঝতেই পারছেন যে কথা কেমন জমা হয়ে আছে! জমানো কথা যেন শেষই হতে চায় না। কথা প্রসঙ্গে মনে হল যে আমরা গারোরা যেমন কথা বলি কম তেমনই কথা বলিও বেশি। চেনা মানুষদের সঙ্গে কথা বলার যেন আর অন্ত থাকে না।

বাস চলা আরম্ভ করল। ধীর গতি থেকে জোর বেগে। যাত্রা শুরু হল ঢাকা থেকে ময়মনসিংহের উদ্দেশে। যখন আমি ছোট ছিলাম, আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে যে আমি প্রতিবারই বছরের এইসময় বাসে করে গ্রামে যখন যাত্রা করতাম তখন বাসের কোনও আসনে না বসে হেল্পার যেখানটায় সাধারণত দাঁড়িয়ে থাকে বাসের বামদিকে একদম সামনের জানালায়, সেখানে দাঁড়িয়েই যাত্রার প্রায় পুরো সময় জুড়ে বাইরে প্রকৃতির দৃশ্য উপভোগ করতাম। মা বরাবরই বলতেন উনার কোলে এসে বসতে, কিন্তু আমি ছিলাম নাছোড়বান্দা। কেন জানি তখন আমার এমন একটা অভ্যাস ছিলো যার উত্তর আমি আজও খুঁজে পাইনি এবং খোঁজার চেষ্টাও করিনি। একসময় ক্লান্ত হয়ে পরলে পরে মা আমাকে কোলে করে নিয়ে আসনে বসতেন আর আমি তখন বাকি যাত্রা নিদ্রায় কাটিয়ে দিতাম। এখন সময়ের সাথে সাথে অভ্যাসেরও পরিবর্তন হয়েছে। ইদানিং আমার একটা অভ্যাস গড়ে উঠেছে, সেটা হল বাসে উঠে কানে ইয়ারফোন লাগিয়ে গান শোনা আর বাসের জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য উপভোগ করা। যখন গানের তালে বাস সামনের দিকে এগিয়ে যায় তখন মনের মধ্যে যে এক অনুভূতির আবির্ভাব হয় তা কথায় প্রকাশ করার মতো ভাষা আমার জানা নেই।

ময়মনসিংহ পৌঁছানোর আগে চুরখায় নামে এক স্থানে আমাদেরকে ছোট একটি যাত্রা বিরতি দেওয়া হয়। যাত্রা বিরতি শেষে বাস যখন আবার চলতে শুরু করল, তখন আমরা ময়মনসিংহে এসে পৌঁছেছি। এখানে এক নদ পেরিয়ে আমাদের গ্রামের উদ্দেশে যেতে হয়। নাম ব্রহ্মপুত্র নদ। ছোট বেলায় আমি এই নদ দেখার জন্য অনেকক্ষণ যাবৎ বাসে জেগে থাকার চেষ্টা করতাম। কিন্তু পারতাম না। মা ডেকে দিত। এই নদকে নদীও বলতাম। তখন আমার মা ও বাবা উভয়েই বলেছিলো যে এটাকে নদ বলা হয়। কারণ ব্রহ্মপুত্র মানে হচ্ছে ব্রহ্মার পুত্র। তাই একে নদীর পরিবর্তে নদ বলা হয়। এই নদ আসাম হয়ে গারো পাহাড় দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এই ময়মনসিংহকে নিয়ে কত কবিই যে কত কথা লিখেছেন উনাদের

লিখনিতে! যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দীনেশচন্দ্র সেনের "ময়মনসিংহ গীতিকা" যা ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়।

ময়মনসিংহ সদর থেকে আমার গ্রামের বাড়ি আরও পঞ্চাশ কি.মি. ভিতরে প্রায় ভারত সীমান্তবর্তী এলাকায়। বিজিবি (বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ) আশ্রয়স্থান সেখান থেকে মাত্র তিন কি.মি. দূরত্বের। বাস সাধারণত যেখানটায় থামে, সেখান থেকেও সাত কি.মি. ভিতরে আমার গ্রামের বাড়ি। গ্রামের পথ, আঁকাবাঁকা কিন্তু পিচ ঢালায় করা প্রশস্ত সে পথ। আমার মনে আছে, যখন আমি ছোট ছিলাম তখন এই পথই ছিলো বন্ধুর। কাঁচা ছোট একটি রাস্তা। বাসও চলত না তেমন। বাস স্ট্যান্ড থেকে রিকশা করে বাড়ি যেতে হতো। আর থানা এলাকার বাজার ছিলো রাস্তা থেকে একদম নিচু অঞ্চলে। এখন বাস অনায়াসেই আসা যাওয়া করে থাকে। গ্রামের রূপ শীতে একরকম আর বর্ষায় আরেকরকম। বর্ষায় বৃষ্টির পর সমস্ত পরিবেশ যেমন সতেজ মনে হয়, তেমনই শীতে সেই সতেজতা লক্ষ্য করা যায় ভোরে শিশিরের পানিতে ভেজা ঘাসের মধ্যে। যেন ঘাসও শিশিরের পানিতে ভিজে মগ্ন হয়ে থাকে।

গ্রামে পৌঁছোতে দুপুর গড়িয়ে গেল। পৌঁছানোর পর সকল গুরুজনদের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে কুশল বিনিময় করে বিশ্রাম ও আহার করে নিই। মধ্যাহ্নভোজ সেরেই আমি বেড়িয়ে পরি আমার এক আত্মীয়ের বাসার উদ্দেশে। আমার বড় মাসির বাসায়। বলে রাখি, আমরা মাসি বলি মায়ের ছোট বোনকে আর বড় মাসি বলি মায়ের বড় বোনকে। বড় মাসিকে আমাদের গারো ভাষায় বলে "আজং"। যেহেতু আমরা গারোরা মাতৃতান্ত্রিক সমাজ মেনে চলি তাই নিয়ম অনুযায়ী আমি মায়ের গ্রামেই প্রথম পদার্পণ করি। যদিও আমি যতবারই গ্রামে বেড়াতে যাই, বাবার গ্রাম না বেড়িয়ে কখনও ঢাকায় ফিরে যাই না।

গ্রামের এই সময়টাতে সকলেই বিভিন্নভাবে সবার ঘর সাজিয়ে থাকে। কেউবা কাগজ কেটে কাগজের বিভিন্ন রূপ দিয়ে ঘর সাজায়, আবার কেউবা রাতে বিভিন্ন আলোকসজ্জা দিয়ে ঘর আলোকিত করে। অনেকে পাইন গাছ (ক্রিসমাস ট্রি) লাগিয়ে সেটাতেও সাজায়। ২৪শে ডিসেম্বর রাত থেকেই পিঠা বানানোর একটা তোড়জোড় সকলের বাড়িতেই শুরু হয়ে যায়। শীতের পিঠা তখন সকলের বাড়িতে গেলেই লক্ষ্য করতে পারবেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে পিঠা খুবই পছন্দ করি। আর অন্য যা কিছু খাবারই আমি না করিনা কেন পিঠাতে কখনও না করবো না।

২৫শে ডিসেম্বর খুব সকালেই আবার সকলে ব্যস্ত হয়ে পরে গির্জায় যাওয়ার জন্য। এই দিনটাকে আমরা বড়দিন হিসেবে পালন করি। আমাদের ধর্ম মতে আমরা বিশ্বাস করি যে এই দিনেই আমাদের ধন্য যীশু খ্রিষ্ট বেথলেহেমের গোশালায় জন্মগ্রহণ করেন। সকালে গির্জায় মিসা শেষ করে আবারও সকলে গুরুজনদের পা ছুঁয়ে প্রণাম করি এবং বড়রা খুশি হয়ে ছোটদেরকে সেলামি দান

করে। এ দিনে সকলে নতুন জামা গায়ে দিয়ে ঘুরতে বের হয়। কিছুটা রমজানের ঈদের সাথে সাদৃশ্য আছে বটে। খাবারের ব্যাপারটা কোনও গ্রামে ওই একই দিনে আয়োজন করে থাকে আবার অনেকে করে পরেরদিন, অর্থাৎ ২৬শে ডিসেম্বর। আমাদের গ্রামেও দ্বিতীয় দিনই খাবারের আয়োজন করা হয়। একটু পরিষ্কার করে বলি, খাবারের আয়োজন বলতে, আমাদের সংস্কৃতিতে আছে যে, প্রতিবছর বড়দিনে একজন ব্যক্তির বাড়িতেই খাবারের আয়োজন করা হবে। আর সেখানে গ্রামের সকল লোকই উপস্থিত থাকবে। আর এটা ক্রমানুসারে বা লটারির মাধ্যমেও হতে পারে যে কার বাড়িতে পরের বছর এই আয়োজন হবে। আপনারা হয়ত ভাবতে বসে গিয়েছেন যে, একজনের বাড়িতে খাবার আয়োজন করা তো একার পক্ষে কষ্টসাধ্য ব্যাপার। হ্যাঁ! তবে এটা পুরোটা উনি একা বহন করতে না পারলে আমাদের সকলের সহযোগিতা সেখানে থাকে। সকলেই কিছু না কিছু নিয়ে বড়দিন বাড়িতে খেতে যায়। কেউ চাল নিয়ে যায় কেউবা সবজি নিয়ে, আবার কেউবা মাংস নিয়ে। সকলেরই কিছু না কিছু অবদান থাকেই। বড়দিনের খাবার যে বাড়িতে হবে, সেখানে কাটাকাটি রান্না-বান্না থেকে সকল কাজই গ্রামের লোক স্বেচ্ছায় করে থাকে। খাবার সাধারণত দুপুর থেকে বিকেল অবধি পরিবেশন করা হয়ে থাকে। খাবারের আগে সকলেই প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করেন। আর সেটা অনুষ্ঠিত হয় বড়দিনের খাবার যার বাড়িতে আয়োজন করা হয়েছে উনার বাড়িতেই। খাবার শেষে অনেকে দূরের হলে বাড়ির উদ্দেশে ফিরে যায়, আবার কাছের হলে অনেকেই গল্পে ও আড্ডায় মত্ত থাকে। যদিও এই আয়োজনে শুধু গ্রামের সকলে উপস্থিত থাকার কথা, কিন্তু মাঝে মধ্যেই আরেক গ্রাম থেকেও আত্মীয় বা অতিথি এসে থাকে এই মধ্যহ্নভোজে। সমাজের সকলের সাথে এই একটি মাত্র দিনেই সবাই মিলিত হয়। দেখলে মনে হবে যেন এক মিলনমেলা।

বাবার গ্রামের বাড়ি হচ্ছে নেত্রকোনা জেলার শিবগঞ্জ থানায়। এই নামে অনেকে না চিনলেও বিরিশিরি বললে বেশিরভাগ লোকই চিনতে পারবেন। বিরিশিরি থেকে বাবার গ্রাম প্রায় পাঁচ কি.মি. পথ। বিরিশিরির গা-ঘেঁষেই সোমেশ্বরী নদীর আবহমান দৃশ্য সকলেরই চোখে পরবে। এই নদী নিয়েও যে কত কথা প্রচলিত আছে! অনেকে বিশ্বাস করে এই নদীতে মৎস্য কন্যার বাস। অনেকে বলে রাক্ষসী নদী। কেননা প্রতি বছরই বহু লোক এই নদীতে ডুবে মারা যায়। কেউবা নদীর পানিতে ডুবে আবার কেউবা চোরাবালিতে ডুবে। এইতো, গতবার যখন বড়দিনের সময় গ্রামে গিয়েছিলাম, তার পরের দিনই আমি বাবার গ্রামে চলে গিয়েছিলাম। তখন আমার বড় পিসি (বাবার বড় বোন) আমাকে বলেছিলেন যে সোমেশ্বরী নদীতে ঘুরতে গেলে যাতে কাছেই ঘোরাঘুরি করি, আর যেখানে মানুষের সমাগম বেশি সেখানটায় থাকি। কারণ, নদী থেকে এখন প্রচুর বালি তোলা হচ্ছে, এতে করে জায়গায় জায়গায় খাদ তৈরি হয়েছে। আর নিচের বালি সরে গিয়ে চোরাবালির মত গড়ে উঠেছে। তাই সেখানে সহজেই যে কেউ ডুবে যায়। শীতে সাধারণত এই নদী

থেকে বালি তোলার কাজ বেশি হয়ে থাকে। আর বর্ষায় পুরো নদীর এপাড় থেকে ওপাড় দেখা মুশকিল হয়ে যায়। দিনকে দিন নদী থেকে বালি তুলে নদীর গভীরতা আরও বাড়িয়ে তুলছে। আমার পিসি আমাকে একটা কাহিনী শুনিয়েছিলো এই নদীকে নিয়ে, সেটা হলো যে, আমরা সেখানে ঘুরতে যাওয়ার কিছুদিন আগেই এক চেয়ারম্যানের ভাগ্নে নদীর চোরাবালিতে ডুবে গিয়েছিলো। তখন বিভিন্ন এলাকা থেকে অনেক লোক জড়ো হয় সোমেশ্বরী নদীর তীরে। অনেক ডুবুরি নিয়ে তল্লাশি চালিয়েও কোথাও কোনও দেহ মিললো না। ঠিক তিনদিন পরে সেই ব্যক্তির মৃতদেহ ভেসে ওঠে ওই নদীতে। এমন হাজারো ঘটনা হরহামেশায়ই হয়ে থাকে এই নদীতে যা বলে শেষ করা যাবে না।

দুর্গাপুরের বিজয়পুর নামটাও হয়ত অনেকে শুনে থাকবেন, যা সাদা মাটির পাহাড়ের জন্য বিখ্যাত। একে অনেকে চীনা মাটির পাহাড়ও বলে থাকে। এই পাহাড়কে যদিও নাম দেওয়া হয়েছে সাদা মাটির পাহাড়, কিন্তু এখানে বিভিন্ন রঙের মাটিও লক্ষ্য করা যায়। আর পাহাড়ের চারিধার নীলাভ রঙের পানিতে বেষ্টিত। যা দেখে যে কারও মনে এই জায়গার সাথে নিজেকে ফ্রেমে বন্দি করার ইচ্ছে জাগবে। বাবার গ্রাম থেকে বেশ উত্তরের দিকে সাদা মাটির এই

পাহাড়। যদিও মোটরসাইকেলে করে গেলে বেশিক্ষণ লাগে না! যতবারই ঘুরতে যাই ইচ্ছে করে পাহাড়টাতে একবার ঘুরেই যায়, কিন্তু সময় স্বল্পতার কারণে তা হয়ে ওঠে না। গতবার বাবার গ্রামে যাওয়ার সময় সেখানে গিয়েছিলাম। মা বলে দিয়েছিলেন এক টুকরো মাটি উনার জন্য নিয়ে যেতে। মা বলেছিলেন লাল মাটি নিয়ে যেতে, অথচ আমি গিয়ে দেখলাম সাদার সাথে বিভিন্ন রঙের ছড়াছড়ি এর মাটিতে।

ঢাকায় ফিরে আসার আগে আমি আবার আমার গ্রামে ফিরে এসেছিলাম। একটা কথা এখনও বলা হয়নি, আমাদের গারোদের এই বড়দিনের সময় রাত্রিবেলায় গ্রামে গ্রামে সকলের বাড়ি ঘুরে কীর্তন করা হয়। একজন গান তুলে বাকিরা তার সুরে তাল দিয়ে তা পুনরাবৃত্তি করে। এ সময় কীর্তনে অংশগ্রহণকারীদেরকে চা, পান ও পিঠা দেওয়া হয়ে থাকে। কীর্তন চলে সন্ধ্যা থেকে ভোর অবধি। অর্থাৎ এই একটি মাত্র দিনে অনেকেই রাত জেগে আনন্দ উপভোগ করে। এই কীর্তনের সুরে যেন সকলের মনে আবার নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়।

পরিশেষে নতুন প্রাণের সঞ্চারণ ও নতুন বছরের প্রতীক্ষায় ঢাকায় চলে আসলাম এবং আবারও কাজের তালে ব্যস্ত সময় কাটাতে থাকলাম। হয়তো আবারও সময় আসবে যখন ফিরে যাবো আর মিশে যাবো সেই ভিন্ন সংস্কৃতিতে।

আমার ক্যারিয়ার ভাবনা

মুহাম্মদ সাইফুল হক
প্রাক্তন এজিএম, মার্কেটিং অ্যান্ড মার্চেন্ডাইজিং
ব্যাবিলন গ্রুপ

ব্যাবিলন কথকতা'র জন্য লেখার বিষয় খুঁজছিলাম বেশ কিছুদিন ধরেই। আজ ফজর নামাজের পর হঠাৎ একটি টপিক এলো যেন মাথায়, আর সাথে সাথেই বসে পড়লাম লেখার জন্য। বিষয়টা হলো জীবনে কী হতে চেয়েছি আর কী হলাম। ছোটকাল থেকেই আমার নেশা ও পেশা পূরণের একটা তাগিদ ছিল। আর তাই আমি ব্রাজিলের একজন প্লেয়ার সক্রেটিস এর মতো হতে চেয়েছিলাম। সক্রেটিস একজন বিখ্যাত ফুটবলার ও ডাক্তার ছিলেন বলে জানতাম আর আমি সেরকম একজন হতে চেয়েছিলাম। যাতে আমার নেশা ও পেশা দুটোর আকাঙ্ক্ষাই পূরণ হতে পারতো। ছোট বেলায় আমি খেলাধুলায় আসক্ত ছিলাম কিন্তু লেখাপড়ায় মাঝারি। ক্লাস এইটের স্কলারশিপ পরীক্ষার সময় থেকে হঠাৎ পড়ার একটা তাগিদবোধ করলাম এবং খেলা কমিয়ে দিয়ে লেখাপড়ায় পূর্ণ মনোযোগ দিলাম। অল্প সময়েই মাঝারি থেকে প্রথম সারিতে চলেও আসলাম। এমনকি ১৯৮৯ সালে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের মুসলিম মডার্ন একাডেমি থেকে বিজ্ঞান বিভাগে সর্বোচ্চ নম্বর ৭৯৯ পেয়ে এসএসসি উত্তীর্ণ হলাম। আমার সাথে সেবার আমার বন্ধু সফিকুর রহমান মানবিক বিভাগ থেকে ৭২১ নম্বর পেয়ে ১৫তম স্ট্যান্ড করে। সারা স্কুলে আমার সাথে আরো দুজন বন্ধু বিজ্ঞান বিভাগে স্টার মার্কস পায়। যাদের একজন এখন বাংলাদেশের বিশিষ্ট ডাক্তার ও অপরজন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত প্রকৌশলী। আমার বন্ধুদের কারও কারও ছোটবেলার স্বপ্নপূরণ হলেও আমার স্বপ্নপূরণ হয়নি। স্কুলের স্বপ্ন নটরডেম কলেজে পড়া পর্যন্ত বেঁচে ছিল কিন্তু ইন্টারমিডিয়েট এর পর ভর্তি পরীক্ষার চ্যালেঞ্জে আর টেকেনি। আমি চান্স পেলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে পড়ার জন্য। বাবা চরম অখুশি কিন্তু আমার স্বপ্ন তখন পরিবর্তিত। এবার স্বপ্ন শিক্ষক হবার এবং নেশায় বুদ্ধিজীবি। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন যুক্ত হলাম শিল্প ও সংস্কৃতি চর্চায়। তখন আমি কণ্ঠশীলন নামক সংগঠনের একজন সদস্য এবং আবৃত্তিতে

কিছুটা জনপ্রিয়, আমার আবর্তনের শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম অবস্থান পাওয়ার কারণে। এই করেই আমার চলছিল- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, কণ্ঠশীলনের সংস্কৃতি চর্চা আর কোচিং সেন্টারে পড়ানো ইত্যাদি নিয়েই। আবার আমার স্বপ্ন ভঙ্গ হলো অনার্স পরীক্ষায় প্রত্যাশিত রেজাল্ট অপ্রাপ্তিতে। এবার যেন স্বপ্ন ভঙ্গের কষ্টটা আমি নিতে পারছিলাম না। অনেকটাই ভেঙ্গে পড়েছিলাম কিন্তু তারপরও মাস্টার্সের প্রস্তুতি নিয়ে চলেছিলাম ভগ্ন হৃদয়েই। তারপর মাস্টার্স পরীক্ষা দিয়েই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও কণ্ঠশীলন দুটোই একেবারে ছেড়ে দিলাম জীবনের নতুন উপলব্ধিতে। এবার যোগ দিলাম তাবলিগে এবং একটি চিল্লাও সমাপ্ত করলাম তারপর জীবনে নতুন বাস্তবতা তৈরি হলো এবং নিজেকে আবার নতুনভাবে গড়ার প্রত্যয় নিলাম। প্রাত্যহিক নিয়মিত নামাজ ও অন্যদের নামাজের দাওয়াত এবং কোন একটি পেশায় নিজেকে যুক্ত করার প্রস্তুতিতে। মৌখিক সাক্ষাৎকারেই সন্তুষ্ট হয়ে আকস্মিক একটি চাকরির প্রস্তাবও এলো পোশাক শিল্পের স্বনামধন্য একটি প্রতিষ্ঠান থেকে। এ যেনো ছিল "মেঘ না চাইতে জল" এর মতো- যোগ দিলাম সেই প্রতিষ্ঠানে মার্চেন্ডাইজিং অফিসার হিসেবে ১৯৯৯ সালের ১লা জুন। ব্যাবিলনে মার্চেন্ডাইজার হিসেবে যোগদানের পর থেকে সময় যেন কেমন দ্রুত বেগে ধাবিত হতে থাকল। যদিও প্রথম দিকে ভাবিনি মার্চেন্ডাইজিংই আমার জীবনের চূড়ান্ত পেশা হিসেবে পরিণত হবে। কাজটাকে উপভোগ করতে শুরু করলাম যোগদানের বছর খানেকের ভীষণ ঝাঁকুনির পর। মাঝে একবার চাকুরি ছেড়ে বিসিএস চেষ্টা করতে চেয়েছিলাম কিন্তু শেষ পর্যন্ত নানা কারণে তা আর হয়নি। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের এক ছাত্রীকে দেখে এমন মুগ্ধ হলাম যে- সে আমার নতুন স্বপ্নে পরিণত হল। এই স্বপ্ন পূরণে অভিভাবকের শরণাপন্ন হলাম এবং শেষ পর্যন্ত সফলও হলাম। এরপর জীবন যেন পূর্ণতা পেলো এবং নতুন স্বপ্নে বিভোর হলাম। জীবনে সফলতাগুলো যেনো আবার ধরা দিতে শুরু করলো। চাকুরির এক বছরের মাথায় মোটরসাইকেল কেনা, তারপর বিয়ে এবং বিয়ের তিন মাসের মাথায় ট্রেনিং এর জন্য বিদেশ ভ্রমণ। তারপর এই যে মার্চেন্ডাইজিং এর চাকা ঘুরতে থাকল আর যেন থামার ফুরসত নেই। বছরে বছরে প্রমোশন ও সহকর্মী বা বসদের উৎসাহ পেয়ে এই পেশাতেই গাঁটছড়া বেঁধে মনোনিবেশ করলাম।

একজন অফিসার থেকে ম্যানেজার হতে আমার সময় লেগেছিল বছর পাঁচেক। তারপর বুঝলাম এটিই সৃষ্টিকর্তা আমার ভাগ্যে রেখেছেন- কাজেই এ থেকে বেরুনোর কোনও উপায় নেই। তাইতো ২০০৬ থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে 'টেক্সটাইল অ্যান্ড এ্যাপারেল মার্কেটিং' এমবিএ-টা করেই ফেললাম প্রাইমএশিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে। আজ আমি এই সেক্টরে কাজ করছি পূর্ণ তেইশ বছর যার প্রথম আঠারো বছর কেটেছিলো ব্যাবিলন গ্রুপেই। তারপর গত পাঁচ বছরে কাজ করেছি গোটা চারেক গ্রুপ কোম্পানিতে। ব্যাবিলন ছাড়ার পর নতুন কোম্পানি

গুলোতে বছর বছর চাকরি পরিবর্তন করেছি নানা কারণে এবং আজ দু'বছর হলো বর্তমান কোম্পানি টিএনজেড গ্রুপে থিতু হয়ে আছি। ব্যাবিলন আমাকে একজন জিএম বানিয়েছে আর আমি সিনিয়র জিএম হিসেবে কাজ করছি অন্তত বছর পাঁচেক। দীর্ঘ তেইশ বছরের ক্যারিয়ারে আনন্দ-বেদনা-সংগ্রাম-সাফল্য-ব্যর্থতার অনেক ইতিহাস আছে। এ যেন সেই কৌতুকের মতো-

- দোস্ত প্রথম দুইটা বছর একটু কষ্ট কর।
- তারপর কি সুখ?
- না, মানে তারপর এই কষ্টটা আর কষ্ট মনে হবে না, সয়ে যাবে।

আজকাল সত্যি আমাদের সেই অবস্থা, আমাদের সয়ে গেছে। এখন আমরা কোন চ্যালেঞ্জেই ভেঙে পড়ি না। বরং চ্যালেঞ্জ আসলেই যেন মনে হয়- এরপর সাফল্য বা স্বস্তির আনন্দ। দেখতে দেখতে বয়সও হাফ সেঞ্চুরিতে এসে পরল- তাই যেন নিজেকে ম্যাচিউর হিসেবে ভাবতে পারছি। ভাবনার অনেক পরিবর্তন এসেছে। আগে কোন ব্যর্থতায় ভেঙে পড়তাম আর সাফল্যে হতাম উচ্ছ্বসিত কিন্তু আজ আর সেরকম হই না। একটা নীতি বা প্রিন্সিপাল বা এসওপি ফলো করি, আর ব্যর্থতা বা সাফল্য- কোনোটাতেই অতি আবেগপ্রবণ হই না।

আজ মানি আমি কেবল সময়ের সাথে বাস্তবতার আলোকে চেষ্টা করতে পারি কিন্তু আমার প্রতিটি চেষ্টাই যে রেজাল্ট বা সাফল্য আনবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। আমরা অনেকগুলো নিয়ামকের মুখাপেক্ষী, তাই কেবল চেষ্টাতেই কাঙ্ক্ষিত সাফল্য সম্ভব নয়। তবে নিজের তরফ থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেও তা মেনে নিতে হয়, এটাই নিয়তি, এটাই ভাগ্য। তবে এটাও ঠিক, কখনও কখনও চেষ্টায় মানুষের দুর্ভাগ্য সৌভাগ্যে পরিবর্তন হয়, কিন্তু না হলে ভেঙে না পড়ে কারণ অনুসন্ধান করে আবার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়।

আমি মনে করি পঞ্চাশ বছর বয়সে নিজেকে আর গোপন রাখার প্রয়োজন নেই। তাই সেই যে বিখ্যাত উক্তি "Justice not only to be done but also to be seen" আমার সহকর্মী মার্চেন্ডাইজারদের বলি- "Merchandising works also not only to be done but also to be seen." তাহলে নিজের কাজটা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। Time Management Training- এ আমার প্রতিটি কলিগ এর কাছ থেকে জেনেছি ২৪ ঘণ্টায় কে কী করে। জেনেছি কত বিচিত্র মানুষের ধরণ- কেউ বলতে ভালোবাসে- তাবলিগে বয়ান করে- কেউ লিখতে ভালোবাসে, গল্প কবিতা লিখে চলেছে, কেউবা রান্না করে, GYM করে, কেউ দাতব্য প্রতিষ্ঠান চালায়, গান করে, কবিতা আবৃত্তি করে আরও কত কী। অবাক হয়েছি কারও লাইফ স্টাইল, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ইত্যাদি জেনে। প্রত্যেকের জীবনই আলাদা, পছন্দ আলাদা, যোগ্যতা আলাদা এমনকি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও আলাদা- তবে এর মাঝে কিছু ব্যাপারে সবাই এক- প্রত্যেকেই সাফল্য চায়। জীবনে, মরণে এবং জীবন-মরণ উভয়টাতেই। তাই আজ নির্দ্বিধায় বলতে

পারি, বাবা-মায়ের ও নিজের ছোট বেলার স্বপ্ন ভঙ্গ হলেই ভেঙ্গে পড়ার কোন কারণ নেই। বরং মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের সাফল্য নির্ভর করে আর তাই বর্তমান অবস্থান মেনে নিয়েই নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার নামই জীবন। বেঁচে থাকা মানুষের পাঁচ মৌলিক চাহিদার (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য) পঞ্চম ও চতুর্থ চাহিদায় পেশার স্বপ্ন আমার জীবনে পূরণ হয়নি কিন্তু দ্বিতীয় চাহিদায় তথা বস্ত্র ব্যবস্থাপনায় পেশার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। আর সে কাজেই নিজেকে চব্বিশ বছর ধরে ব্যস্ত রেখেছি। সারা বিশ্বের মানুষের কাঙ্ক্ষিত বস্ত্র উৎপাদন সেবার লক্ষ্যে এই পোশাক শিল্পে কাজ করে প্রায় চার মিলিয়ন মানুষ, পরিবার। আর আমাদের মতো ছোট্ট আয়তনের জনবহুল দেশে থেকেও আমরা বিশ্বের মানুষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছি। আমরা দেশের জন্য এনে দিচ্ছি প্রায় পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলার এবং সেই সাথে বিশ্ববাসীর আস্থা, পরিচিতি। কাজেই আজ আমি স্বপ্ন ভঙ্গের সুফল পাচ্ছি বলে মনে হয়- অনেকটা যেন সাপে বরের মতো। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ঘুরেছি, সরকারকে প্রতি বছর ট্যাক্স দিচ্ছি ও জনকল্যাণ কর্মে সম্পৃক্ত আছি। কাজেই আমার পেশা নিয়েই আমি তৃপ্ত।

তবে আজও পেশার সাথে নেশার চাপটা বোধ করি। তাইতো পেশায় আমি মার্চেন্ডাইজার হলেও নেশায় আবৃত্তিকার, ভাষা ও সৌজন্যবোধের প্রচারক। আজকাল আমার নেশাটাকে আরও একটু উচ্চ ধাপে নিয়ে কর্পোরেট ট্রেইনার হওয়ার চেষ্টা করে চলেছি। আমার সহকর্মীদের নিয়ে Communication Skill ও Time Management বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেই। আসলে আজ আমি আর স্বপ্ন ভঙ্গের দুঃখ বোধ করি না কেননা বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষই জানে না সে কোন পেশায় ভালো করবে। হাতে গোনা মাত্র কয়েকটি পেশা আমাদের সময় বেশি সামাজিক মর্যাদা পেত, আমিও সেরকম ভাবনার শিকার। নিজের জন্য কোনটা ভাল না জেনেই আমরা অনেক সময় স্বপ্ন দেখি। আর তাই সময়ের সাথে স্বপ্ন পরিবর্তনও হয়। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হলো স্বপ্ন ভঙ্গের হতাশা যেন কাউকে পেয়ে না বসে। আমি অল্পের জন্য হতাশা ভঙ্গের শিকার হইনি বলে আজও স্বপ্ন দেখে চলেছি। এখন স্বপ্ন দেখি জীবনের চূড়ান্ত সফলতার। আজও আমি একজন কর্মী- তাই পেশা ও নেশা পূরণের তাগিদ আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়।

প্লুটো

এসএম এমদাদুল ইসলাম
পরিচালক
ব্যাবিলন গ্রুপ

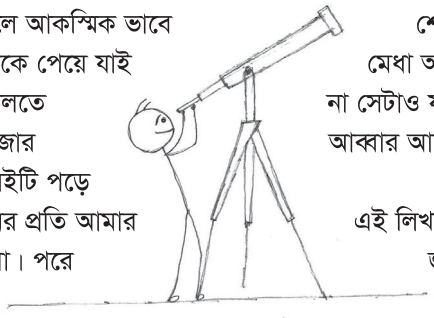

অষ্টম শ্রেণিতে পড়াকালে আকস্মিক ভাবে এক সহপাঠীর কাছ থেকে পেয়ে যাই একটা মজার বই। 'খেলতে খেলতে বিজ্ঞান' বা 'মজার খেলা বিজ্ঞান' নামের বইটি পড়ে যেন রাতারাতি বিজ্ঞানের প্রতি আমার আগ্রহ তৈরি হয়ে গেলো। পরে জেনেছি বাজারে এই ধরনের বই তখন পাওয়া যেতো। সাধারণ পাঠক পাঠিকাদের জন্য মার্কিন লেখকদের লেখা বিজ্ঞান বিষয়ক বইয়ের বাংলা অনুবাদ তখন হতো ও তা কোনও এক মার্কিন প্রকাশনাসংস্থার আর্থিক সহায়তায় প্রকাশিত হতো। ওই বইটি পড়ার পর থেকেই আমার ধ্যান জ্ঞান হয়ে গেলো বিজ্ঞান। বিজ্ঞান নিয়েই পড়লাম ক্লাস নাইন থেকে। এরপর থেকে রসায়ণ, পদার্থ বিদ্যা, অনু পরমাণু, জ্যোতির্বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে সোজাসরল বই বা পত্রিকা অনেক পড়েছি। প্রথমে বাংলায় অনুবাদ করা বই, পরে সরাসরি ইংরেজিতে লিখা বই। জীববিদ্যায় আমার তেমন আগ্রহ ছিলো না। তাই আব্বার প্রচণ্ড পছন্দ সত্ত্বেও ডাক্তারি পড়বার কোনও আগ্রহ আমার কখনও হয়নি। ইঞ্জিনিয়ার হতেও আমি চাইনি। চেয়েছি জ্যোতির্বিজ্ঞানী বা পরমাণু বিজ্ঞানী হতে। যাক, সে সব কিছুই হইনি শেষ পর্যন্ত। ওসব হবার মেধা আমার আদৌ ছিলো কি না সেটাও যাচাই করা সম্ভব হয়নি আব্বার আর্থিক সঙ্গতির অভাবে।

এই লিখাটা লিখতে বসেছি ১৬ জুলাই, ২০২২ তারিখে ক্যানাডার টরন্টোর নর্থ ইয়র্কে অবস্থিত ছোটো মেয়ের অ্যাপার্টমেন্টে বসে। মাত্র ক'দিন আগে ১২ জুলাই গোটা দুনিয়ায় তোলপাড় তুলেছে জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের পাঠানো অসাধারণ কিছু ছবি। এই দুরবিন মহাকাশে থেকে লোকচক্ষুর আড়ালে মহাকাশের গভীরে ডুব দিয়ে থাকা কিছু দৃশ্যের ছবি তুলেছে, আরও তুলবে। জেমস ওয়েব টেলিস্কোপের আগে মহাকাশের দিকে চোখ রেখেছিলো হাবল (Hubble) টেলিস্কোপ। তখন এই হাবল টেলিস্কোপই ছিলো একমাত্র উল্লেখযোগ্য। এখন সেই হাবল স্পেস টেলিস্কোপকে পিছনে হটিয়ে দিয়েছে এই জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ।

হাবল স্পেস টেলিস্কোপ মহাশূন্যে পাঠানো হয় ১৯৯০ সালে। এই প্রজেক্টের চিন্তা বিজ্ঞানীদের মাথায় আসে ১৯৪৬ সালে। তবে মহাকাশে টেলিস্কোপ পাঠানোর

ধারণা বিজ্ঞানীদের মাথায় প্রথম আসে ১৯২৩ সালে, আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে। মহাশূন্যে রকেট উৎক্ষেপণের চিন্তার সাথে সাথেই মানুষ সেখানে টেলিস্কোপ পাঠাবার সম্ভাবনার কথা ভাবতে পেরেছে। বিষয়টা কিন্তু খুবই অসাধারণ।

হাবল টেলিস্কোপ প্রকল্পের বাস্তবায়নে সময় লেগে যায় প্রায় পঞ্চাশটি বছর। এডউইন পাওয়েল হাবল (Edwin Powell Hubble - ১৮৮৯-১৯৫৩) নামের প্রসিদ্ধ এক আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানীর নামে এর নামকরণ হয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানে এই হাবল সাহেবের অনেক অবদান রয়েছে। আমাদের ছায়াপথ মিল্কি ওয়ে ছাড়াও যে মহাবিশ্বে আরও অনেক ছায়াপথ রয়েছে সেটা তারই আবিষ্কার। ছায়াপথগুলো পরস্পর থেকে ক্রমশ দ্রুত দূরে সরে যাচ্ছে এই তত্ত্বও তার দেওয়া। দূরত্ব বাড়ার সাথে সাথে মহাজাগতিক বডিগুলোর ক্রমশ গতি বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়ে তার উদ্ভাবিত একটা সূত্রও রয়েছে, যাকে বলা হয় হাবলের সূত্র। কাজেই মহাকাশে অবস্থান নেওয়া পৃথিবীর প্রথম মহাকাশ টেলিস্কোপের নাম এডউইন হাবলের নামে করাটা অযৌক্তিক হয়নি মোটেই।

তা হাবল স্পেস টেলিস্কোপের দরকার হলো কেন? এই টেলিস্কোপটিকে মহাশূন্যে প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত মহাকাশ পর্যবেক্ষণ হতে পারতো কেবল পৃথিবীর বিভিন্ন নির্জন ও উঁচু জায়গায় বসানো টেলিস্কোপের মাধ্যমে। এগুলোর বেশিরভাগ অপটিক্যাল টেলিস্কোপ নয়, রেডিও টেলিস্কোপ। কোনও বস্তু থেকে আলো এসে অপটিক্যাল টেলিস্কোপের লেন্সের ভেতর দিয়ে ঢুকে বা আয়নায় পড়ে প্রতিবিম্ব তৈরি করলে তা মানুষ দেখতে পায়। সেই প্রতিবিম্বের ছবিও তোলা যায়। খুব বেশি ব্যাসের অপটিক্যাল টেলিস্কোপ বানানো কঠিন কাজ, বানালে তা হয় ভীষণ ভারী। সেগুলো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরিয়ে নিয়ে বসানো বেশ ঝক্কির, মহাশূন্যে উড়িয়ে নিয়ে ব্যবহার করা আরও কষ্টকর ও দারুণ ব্যয়বহুল। রেডিও টেলিস্কোপে বড়ো বড়ো ডিশ অ্যান্টেনা থাকে যেখানে দূরাকাশের নক্ষত্র বা ছায়াপথ থেকে আসা রেডিও সিগনাল বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক সিগনাল ধরা হয় ও পরে তা বিশ্লেষণ করা হয়। পরে সেই বিশ্লেষণ করা তথ্যকে সবার চোখে দেখার উপযোগী ছবিতে পরিণত করা হয়। চাঁদ, গ্রহ, ধূমকেতু এ সব দেখবার জন্য অপটিক্যাল টেলিস্কোপ কার্যকর, তবে দূর নক্ষত্র, নীহারিকা, নক্ষত্রপুঞ্জ বা ছায়াপথ পর্যবেক্ষণের জন্য চাই রেডিও টেলিস্কোপ। রেডিও টেলিস্কোপ দিবারাত্র কাজ করতে পারে, কাজ করতে পারে মেঘলা আকাশেও। অপর দিকে অপটিক্যাল টেলিস্কোপে কিছু দেখতে মেঘমুক্ত পরিষ্কার আকাশ চাই। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল, সেখানে ঝড়ঝাপ্টা, এতে উপস্থিত ধূলিকণা এগুলো পর্যবেক্ষণে বড়ো এক বাধা। কাজেই ডিপ স্কাইতে উঁকি মারতে রেডিও টেলিস্কোপের যোগ্য বিকল্প নেই।

হাবল স্পেস টেলিস্কোপ মহাকাশের বিভিন্ন অবজেক্ট থেকে আসা রেডিও সিগনালকে

বিশ্লেষণ করে তার প্রতিচ্ছবি তৈরি করে। তখন সেই ছবিকে অপটিক্যাল টেলিস্কোপে দেখে ধারণ করা ছবির মতোই লাগে। এই টেলিস্কোপটি ১৯৮৬ সালেই মহাশূন্যযাত্রার জন্য তৈরি ছিলো। কিন্তু সেই বছর জানুয়ারি মাসে স্পেস শাটল চ্যালেঞ্জার মহাকাশযানটির উৎক্ষেপণ ব্যর্থ হয় ও শাটলটি উড়ে যাবার খুব অল্প পরেই বিস্ফোরিত হয়ে ভেঙে যায়, সাথে নিহত হয় সাত নভোচারির সকলে। এরকম এক দুর্ঘটনার পরে বেশ লম্বা সময়ের জন্য স্পেস শাটল প্রজেক্ট বন্ধ থাকে। হাবল টেলিস্কোপটিও মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত হতে পারে না। বেশ পরে ১৯৯০ সালের এপ্রিলে এটি শাটল ডিসকোভারির মাধ্যমে মহাশূন্যে উড়ে যায়।

হাবল টেলিস্কোপের মিররের ব্যাস হলো ২.৪ মিটার। এই টেলিস্কোপটির রক্ষণাবেক্ষণের বিধান রাখা হয় এমন ভাবে যাতে দরকারে নভোচারিরা মহাশূন্যে উড়ে গিয়ে সেই কাজগুলো করতে পারেন। ১৯৯৩ সালে প্রথমবারের মতো নভোচারিরা গিয়ে হাবল টেলিস্কোপের একটা আয়নার ত্রুটি সারান। প্রতিফলক আয়নার অতি সূক্ষ্ম একটা কৌণিক ত্রুটি সারানোর ফলে হাবল টেলিস্কোপ দিয়ে ধারণ করা মহাজাগতিক বিষয়বস্তুর ছবিতে যে একটা অপটিক্যাল অ্যাবারেশন ছবির কিনার ঝাপসা করে দিতো সেই সমস্যা দূর হয়ে যায়। ওই প্রথমটার পরে আরও চারটি এরকম রক্ষণাবেক্ষণ বা মেরামতি অভিযান চালানো হয়েছে। এর সর্বশেষটি ছিলো ২০০৯ সালে। এই টেলিস্কোপটি সর্বোচ্চ দশ বছর ধরে সার্ভিস দেবে ভেবে পাঠানো হলেও আজ ৩২ বছরেরও বেশি সময় ধরে সেটি কার্যক্ষম রয়েছে। মনে করা হচ্ছে যে এটি ২০৪০ পর্যন্ত টিকে যেতে পারে। ভূপৃষ্ঠ থেকে মহাকাশে মাত্র ৩৪০ মাইল উচ্চতার এক কক্ষপথে বসে হাবল টেলিস্কোপ মূলত আল্ট্রা ভায়োলেট রশ্মি বিশ্লেষণ করে প্রতিচ্ছবি তৈরি করে। হাবল টেলিস্কোপ প্রদক্ষিণ করে পৃথিবীকে। পৃথিবীর দুরবিনগুলো বায়ুমণ্ডলের ওজোন গ্যাসের উপস্থিতির কারণে আল্ট্রা ভায়োলেট আলো খুব কমই পায়। ফলে আরও দূরে মহাশূন্য থেকে দক্ষ ছবি তোলার সমকক্ষ এরা হতে পারে না। হাবল টেলিস্কোপ অসংখ্য ছবি পাঠিয়েছে যার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য কিছু হলো –

ঈগল নীহারিকা (Eagle Nebula), যাতে রয়েছে গ্যাসের বিশাল কিছু স্তম্ভ, যার জন্য সেই অংশের আরেকটা নামকরণ হয়েছে 'সৃষ্টির স্তম্ভ' বা পিলার অভ ক্রিয়েশন।

সাতটা অতি আদিম ছায়াপথ আবিষ্কার করেছে যেগুলোর সৃষ্টি ১৩ বিলিয়ন বছর আগে। এর অর্থ হলো সেগুলো বিশ্ব সৃষ্টির মাত্র ৭০০ মিলিয়ন বছর পরের ছায়াপথের ছবি।

হাবল টেলিস্কোপের আরেকটা কীর্তি হলো ক্র্যাব বা কাঁকড়া নেবিউলার ছবি তোলা। এর আগে জানা ছিলো না প্লুটোর এমন দুটো উপগ্রহ দেখতে পেয়েছে এই টেলিস্কোপ।

হাবল টেলিস্কোপের কারণে বিশ্ব সৃষ্টির বয়স ১৩.৭ বিলিয়ন বছর নিশ্চিত করা গেছে। হাবলের সাফল্যের মধ্যে এক্সোপ্ল্যানেট আবিষ্কারও রয়েছে। এক্সোপ্ল্যানেট হলো আমাদের সৌরজগতের বাইরে কোনও গ্রহ যার নিজস্ব নক্ষত্র রয়েছে এবং যাকে কেন্দ্র করে সেই গ্রহ প্রদক্ষিণ করে বেড়ায়।

হাবল টেলিস্কোপ তৈরিতে পর্যায়ক্রমে দুই বিলিয়ন ডলার ব্যয় হলেও পরবর্তীতে এর দেখভাল ও মেরামতির জন্য মিশন পাঠানোর কাজে মোট ব্যয় দাঁড়িয়ে যায় দশ বিলিয়ন ডলারে।

আমার এই লিখা হাবল টেলিস্কোপ নিয়ে শুধু নয়। এই মুহূর্তের অন্যতম আলোচ্য বিষয় জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ, যা বর্তমান সময়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ বৈশ্বিক মুদ্রাস্ফীতি, রাশিয়া-ইউক্রেন বিবাদ, ইত্যাদিকে পাশ কাটিয়ে সবার উপরে জায়গা করে নিয়েছে – সেই টেলিস্কোপ বিষয়ে কিছু কথা।

১৯৯৬ সাল থেকে এই টেলিস্কোপ, যার প্রাথমিক নাম ছিলো দি নেক্সট জেনারেশন স্পেস টেলিস্কোপ, এর ডিজাইনের কাজ শুরু হয়। ধারণা করা হয়েছিলো ২০০৭ নাগাদ টেলিস্কোপটি নির্মাণের কাজ শেষ হবে। এর প্রাথমিক বাজেট ছিলো এক বিলিয়ন ডলার। তবে ২০১৬ সালে যখন এটার নির্মানকাজ শেষ হয় তখন খরচ দাঁড়ায় ১০ বিলিয়ন ডলারে। এই স্পেস টেলিস্কোপের পুনঃনামকরণ করা হয় জেমস এডউইন ওয়েব (James Edwin Webb - ১৯০৬-১৯৯২) নামের নাসা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর-এর নামে। ইনি ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত আমেরিকার নাসা বা ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স এন্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এর দায়িত্বে ছিলেন। তার আমলে মারকারি, জেমিনি ও অ্যাপোলো স্পেস প্রোগ্র্যামগুলো হয়।

জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপটিকেও মহাশূন্যে তার কক্ষে পাঠাতে দেরি হয়ে যায়। অবশেষে ২০২১ সালের ২৫ ডিসেম্বর মহাশূন্যে পাঠানো হয় এই অসাধারণ টেলিস্কোপটিকে একটি আরিয়ান (Arian) রকেটের মাধ্যমে। এটিকে হাবল টেলিস্কোপের চাইতে অনেক দূরে পৃথিবী থেকে ৯,৩২,০০০ মাইল দূরের এক কক্ষে তুলে দেওয়া হয়, যেখান থেকে সে পৃথিবীকে নয়, সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। এই দুরবিন যেহেতু ইনফ্রারেড আলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে কাজ করে তাই এর দরকার অতিশীতল এক পরিবেশ। এটা হাবল টেলিস্কোপের উল্টো অবস্থা। হাবল পৃথিবীর খুব কাছে থেকে কাজ করে আসছে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ পরিবেশে – যা অতিবেগুনি রশ্মির জন্য কোনও সমস্যা নয়।

মূলত ইনফ্রারেড রশ্মি নির্ভর জেমস ওয়েব দুরবিন কাজ করছে অকল্পনীয় মাইনাস ২২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায়। এটার নিজের শরীর থেকে নির্গত হওয়া ইনফ্রারেড তাপ যাতে দূরাকাশ থেকে আসা ইনফ্রারেড রশ্মিকে প্রভাবিত করতে

না পারে তার জন্য এই অতিশীতল ব্যবস্থা। এখানে একটু বলে রাখি ইনফ্রারেড বা অবলোহিত তরঙ্গের দৈর্ঘ্য খুব বেশি, পক্ষান্তরে আল্ট্রাভায়োলেট বা অতিবেগুনি রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য খুবই কম। সেই কারণে অতিবেগুনি রশ্মির অনেকটাই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আটকে যায়। আর সেই কারণেই হাবল স্পেস টেলিস্কোপকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সীমার বাইরে উঠিয়ে বসানো হয়েছে, যাতে অতিবেগুনি রশ্মির মাধ্যমে মহাকাশ পর্যবেক্ষণে দুরবিনটির সমস্যা না হয় বা সমস্যা কম হয়।

হাবল টেলিস্কোপের আয়নার ব্যাস হলো ২.৪ মিটার, সেখানে জেমস ওয়েবের মিররের বিস্তার হলো ৬.৫ মিটার – অনেক বড়ো। আরেকটা বিষয় হলো হাবল টেলিস্কোপটির ডিজাইন ও তার কক্ষপথ রাখা হয়েছিলো এমন ভাবে যাতে করে নভোচারিরা উড়ে গিয়ে সেটাকে দরকারি মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারেন। জেমস ওয়েব টেলিস্কোপের ক্ষেত্রে বিষয়টা তা নয়। কোনও নভোচারী উড়ে গিয়ে ওটার দেখাশুনা করবে না। এর অবস্থা নির্ভর করবে ভাগ্যের উপর, আর পৃথিবী থেকে দূর নিয়ন্ত্রণে যতটুকু দেখভাল করা যাবে ততটুকুর উপর।

নিজ কক্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়েই জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ কিছু অসাধারণ ছবি পাঠিয়ে পৃথিবীর সকল বোদ্ধা বা তেমন বোদ্ধা নয় এমন সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে, তোলপাড় তুলে দিয়েছে বিশ্বজুড়ে। কী এমন ছবি এই দুরবিনটি পাঠালো?

১২ জুলাই, ২০২২ জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ তার ধারণকৃত মহাশূন্যের বেশ কিছু অতি উচ্চ রেজুলিউশনের ঝকঝকে ছবি পাঠিয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে মহাশূন্যের গভীর থেকে তুলে আনা – মৃত্যুপথযাত্রী নক্ষত্রের ছবি, নীহারিকার ছবি, পরস্পরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত ছায়াপথের ছবি, নতুন নক্ষত্রের জন্ম নেবার ছবি ইত্যাদি। আরেকটা কাজ সে করেছে যা হলো আমাদের সোলার সিস্টেমের সর্ববৃহৎ গ্রহ বৃহস্পতির চাইতেও আকারে বড়ো এমন একটা এক্সোপ্ল্যানেট আবিষ্কার করা। সৌরজগতের বাইরের এই গ্রহটি তার নক্ষত্রটিকে মাত্র তিন দিনে প্রদক্ষিণ করছে।

কিছু ছবি তৈরি হয়েছে ১৩.১ বিলিয়ন বছর বা তার চাইতেও বেশি সময় আগে রওনা হয়ে আসা আলো থেকে। বিজ্ঞানীদের মতে মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে ১৩.৭ বিলিয়ন বছর আগে। তার মানে হলো বেবি ইউনিভার্সের ছবি ধারণ করতে পেরেছে জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ। প্রাথমিক ছবিগুলো দেখেই মনে হবে এই দুরবিন তার বায়োনিক দৃষ্টি মেলেছে নক্ষত্র-নীহারিকা-ছায়াপথ জগতের এক বাগানে, যেখানে প্রবীণদের জীবনপ্রদীপ নিভে যাচ্ছে, যুবারা নিজ রূপসুষমায় জ্বলে উঠছে, জন্ম হচ্ছে নক্ষত্র-নীহারিকা জগতের শিশু সদস্যদের। চমৎকার মেঘপুঞ্জের স্তম্ভের মতো বিলীন হয়ে যাওয়া নক্ষত্র থেকে সৃষ্ট গ্যাসপুঞ্জের দেখা মিলছে সেই বাগানে। এ সব ছবির চোখ জুড়ানো বর্ণচ্ছটা ও তার বিচিত্র আকারপ্রকারে মনে

হবে চমৎকার একটা ল্যান্ডস্কেপ বা সিটিস্কেপের মতো এই ডিপস্পেসস্কেপের একটা বাঁধানো ছবি বাড়ির বসার ঘরের দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখি। হাবল টেলিস্কোপের মতো এই জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপকেও ডিজাইন করা হয়েছে একটানা পাঁচ থেকে দশ বছর কার্যক্ষম থাকার জন্য। কিন্তু মনে করা হচ্ছে তার পূর্বসূরির মতো জেমস ওয়েব টেলিস্কোপও কুড়ি বছর বা তার চাইতে বেশি সময় ধরে কার্যক্ষম থাকবে। জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের পরেও কি কিছু আছে? আছে।

সেটা হলো লার্জ আল্ট্রাভায়োলেট অপটিক্যাল ইনফ্রারেড সারভেয়র বা LUVOIR (লুভোয়ার) স্পেস টেলিস্কোপ প্রজেক্ট। ইতোমধ্যে নাসা এই প্রজেক্টের কাজ শুরু করে দিয়েছে। এই স্পেস দুরবিনটি একটা মল্টি ওয়েভলেংথ স্পেস টেলিস্কোপ যা আল্ট্রাভায়োলেট, স্বাভাবিক আলো ও ইনফ্রারেড তরঙ্গের সাহায্যে কাজ করবে।

নাসা সেই ২০১৬ সালে প্রথম মোট চার ধরনের স্পেস টেলিস্কোপের ধারণা নিয়ে কাজ করতে শুরু করে। এই টেলিস্কোপগুলোকে মূলত ভবিষ্যতে খুব বড়ো আকারের কৌশলগত বিজ্ঞান অনুসন্ধানের (Large Strategic Science Missions) জন্য ভাবা হয়েছিলো। এই চারটে প্রজেক্টের একটা হলো এই LUVOIR । ২০১৯ সাল নাগাদ চারখানা প্রস্তাবের কনসেপ্ট পেপার নাসার কাছে প্রস্তাব করা হয়। পরে এরকম সিদ্ধান্ত হয় যে ফান্ড পেলে লুভোয়ার প্রজেক্টের আওতায় একটা নতুন স্পেস টেলিস্কোপ ২০৩৯ সাল নাগাদ সান আর্থ লাগ্রাঞ্জ ২ (Sun-Earth Lagrange 2) কক্ষপথে স্থাপিত করা হবে। এই কক্ষপথটি পৃথিবী থেকে প্রায় ১৫ লক্ষ কিলোমিটার বা প্রায় ৯ লক্ষ ৩২ হাজার মাইল দূরে এমন একটা জায়গায় অবস্থিত যেখানে কোনও একটা ছোটো আকারের বা ভরের স্যাটেলাইট সূর্য বা পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য কোনও আকর্ষণ বিকর্ষণের প্রভাবমুক্ত থাকতে পারবে। আকর্ষণ বিকর্ষণের একটা ভারসাম্য অবস্থা সেখানে বিরাজ করে। জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপকেও সেই অঞ্চলেই বসানো হয়েছে।

লুভোয়ার প্রজেক্টের মূল উদ্দেশ্য হলো মহাশূন্যে এক্সোপ্ল্যানেট খুঁজে বার করা যেখানে জীবনের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব, বা যেখানে কোনও প্রাণী হয়তো আগে থেকেই বসবাস করছে। এই টেলিস্কোপ মহাকাশে প্রাণের চিহ্ন খুঁজবে, বসবাসযোগ্য গ্রহের উপস্থিতি খুঁজবে, যেখানে ভবিষ্যতে মানুষ যেতে পারবে, বসতি স্থাপন করতে পারবে, ইত্যাদি। এসবের বাইরে মহাকাশ বিষয়ক অন্যান্য প্রচলিত গবেষণাতো থাকবেই। ছায়াপথের জন্ম, বিকাশ – এর সবকিছু। এই টেলিস্কোপটি বিশেষ করে আমাদের সৌরজগতের দিকেও চোখ রাখবে। লুভোয়ার-এর দুটো সম্ভাব্য মডেল পেশ করা হয়েছে। এর একটার আয়নার ব্যাস হলো ১৫.১ মিটার (লুভোয়ার-এ),

অপরটির ব্যাস হলো ৮ মিটার (লুভোয়ার-বি)। লুভোয়ার এর প্রাথমিক বয়সকাল ধরা হয়েছে পাঁচ থেকে দশ বছর, তবে নিক্ষিপ্ত হবার পর এটিও নিশ্চয় আরও অনেক বেশি সময় ধরে মহাশূন্যে থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের জন্য কাজ করে যাবে। তবে ইতোমধ্যে জেমস ওয়েব টেলিস্কোপে গ্রহাণুর আক্রমণ ঘটেছে এবং তাতে করে তার লেন্সসম আয়নার একটা অংশ চূড়ান্ত ভাবে ক্ষতিগ্রস্তও হয়েছে বলে জানা গেছে মাত্র তিনদিন আগে (২১ জুলাই, ২০২২)। সেরকম কিছু হলে পরিস্থিতি কী হবে কে জানে। তবে বিজ্ঞানীদেরকে এই ঝুঁকিটুকু বোধ হয় নিতেই হচ্ছে। আমার এই জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক রচনাটির মূল উদ্দেশ্য ছিলো অবমূল্যায়িত গ্রহ প্লুটো সম্পর্কে কিছু বলার।

প্লুটো নিয়ে বলার আগে সৌরজগতের কাইপার বেল্ট (Kuiper belt) সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। কাইপার বেল্ট – এটা সৌরজগৎ সৃষ্টির পরে অবশিষ্ট পদার্থ দিয়ে তৈরি একটা জমাট বাঁধা গ্যাস ও পানির উপস্থিতির অঞ্চল। এর অবস্থান সৌরজগতের মধ্যেই, তবে সূর্য থেকে অনেক দূরে। এর সাথে মঙ্গল গ্রহ ও বৃহস্পতি গ্রহের মোটামুটি মাঝখানে ভেসে বেড়ানো অ্যাস্টেরয়ড বা গ্রহাণুর একটা বেল্টের সাথে কিছুটা তুলনা চলে, তবে অ্যাস্টেরয়েড বেল্টের সাথে কাইপার বেল্টের মূল পার্থক্য হলো কাইপার বেল্টে গ্রহাণুর মতো কঠিন বস্তু তেমন নেই, আছে জমাট বাঁধা গ্যাস (অ্যামোনিয়া, মিথেন – এ সব), যার ভেতর জমাট বাঁধা জলও রয়েছে। কাইপার বেল্টের বিস্তার সৌরজগতের অষ্টম গ্রহ নেপচুন থেকে শুরু হয়ে সৌর জগতের বাইরের দিকে বিস্তৃত হয়ে আরও প্রায় ২০ অ্যাস্ট্রনোমিক্যাল ইউনিট পর্যন্ত। এক অ্যাস্ট্রনোমিক্যাল ইউনিট (AU) মোটামুটি পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব বা ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইলের সমান। কাইপার বেল্টের বিস্তারের মধ্যে যে সব কঠিন বস্তু রয়েছে সেগুলোকে বিজ্ঞানীরা বামন গ্রহ (Dwarf planet) -এর মর্যাদা দিয়ে থাকেন। এই বেল্টে অবস্থান করা কয়েকটি উল্লেখ করার মতো বামন গ্রহ হলো প্লুটো, এরিস (Eris), হামিয়া (Haumea), অরকাস (Orcus), ইত্যাদি। এগুলোর ভেতরে প্লুটো আকারে বাকিগুলোর থেকে বড়ো, তবে এরিস প্লুটোর প্রায় কাছাকাছি। ১৯৩০ সালে আবিষ্কৃত হবার পর থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত প্লুটো তার পূর্ণ গ্রহের মর্যাদা ধরে রেখেছিলো। একটা বিশেষ কারণে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ২০০৬ সালে এসে প্লুটোর পদাবনতি ঘটিয়ে দিয়েছেন। প্লুটো আবিষ্কারের কথা একটু বলবো, সাথে বলবো এর নামকরণের সাথে জড়িয়ে থাকা একটা মজার বিষয়ও। তার আগে পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ চাঁদের ওজনের এক ষষ্ঠাংশ ওজনধারী প্লুটোকে কেন মর্যাদার দিক থেকে নিচে নামিয়ে দেওয়া হলো তাই নিয়ে একটু কথা। খুদে বামন গ্রহ প্লুটোর আবার পাঁচ পাঁচটা উপগ্রহ রয়েছে যার মধ্যে যেটির নাম শ্যারন (Charon) সেটি সবার বড়ো এবং তার ব্যাস স্বয়ং প্লুটোর অর্ধেক।

গ্রহের মর্যাদা পেতে গেলে যে সব শর্ত পূরণ করতে হয় তা প্লুটো করতে পারেনি। কী সেই শর্তগুলো? তিনটে প্রধান শর্ত –

*একটা গ্রহ নিজ কক্ষে থেকে নিজস্ব নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে ঘুরবে। আমাদের সৌরজগতের ক্ষেত্রে সেই নক্ষত্র হলো সূর্য।

*গ্রহ মর্যাদালাভে আগ্রহী এই প্রার্থীর ভর কম পক্ষে ততোটাই হতে হবে যতোটা থাকলে বস্তুটি তার নিজস্ব মাধ্যাকর্ষণ দিয়ে আপন শরীরটাকে একটা গোলকে পরিণত করে ধরে রাখতে পারে।

*নিজ নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণরত তার সমকক্ষ আর কোনও বস্তুর ভর তাকে বা তার প্রদক্ষিণের কক্ষপথকে প্রভাবিত করতে পারবে না, বা করবে না।

প্রথম শর্তদুটোতে পাস করলেও হতভাগ্য প্লুটো তিন নম্বর শর্তে ফেল মেরেছে। সে তার প্রতিবেশী গ্রহ নেপচুন ও বিশালাকৃতির ইউরেনাসের আকর্ষণের কাছে পরাভূত হয়ে আছে। ফলে তার বার্ষিক প্রদক্ষিণ পথেও মস্ত বিচ্যুতি চোখে পড়ে এবং সে একটা বিকট রকম ডিম্বাকৃতি কক্ষে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এরকম এলিপ্টিক্যাল অরবিট সৌরজগতের আর কোনও গ্রহের নেই।

ইউরেনাস গ্রহ আবিষ্কারের পরে তার প্রদক্ষিণ পথে কিছু বিচ্যুতি লক্ষ করে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এক সময় মনে করেন এর কারণ নিশ্চয় অন্য কোনও একটা গ্রহ বা সে রকম কিছুর আকর্ষণ। সেইটা ভেবে অঙ্ক করে তারা এমনকী ওই অজ্ঞাত গ্রহ বা সেরকম কিছুর সম্ভাব্য অবস্থান বের করে ফেলেন। পরে দুরবিন দিয়ে খুঁজে খুঁজে ঠিকই পেয়ে যান তারা নেপচুনের অস্তিত্ব। প্লুটোর আবিষ্কারও অনেকটা ওরকম ভাবেই হয়েছিলো। অ্যাস্ট্রনোমিক্যাল ফটোগ্রাফি প্লেটে এর অস্তিত্ব ১৯৩০ সালের আগেই ধরা পড়েছিলো। তবে এটাকে বিশেষ ভাবে সনাক্ত করতে সেই ১৯৩০ পর্যন্ত লেগেছে। তখন সেটাকে গ্রহ ভেবেই প্লুটো নামকরণটি করা হয়। কী ভাবে তা হলো? এইটাই বর্তমান রচনাটির আসল অনুপ্রেরণা আমার। সেই কাহিনীটা বলি। তার আগে ধান ভানতে গিয়ে একটু শিবের গীত গেয়ে নিলাম।

প্লুটো আবিষ্কারের কৃতিত্ব দেওয়া হয় আমেরিকান জ্যোতির্বিদ ক্লাইড উইলিয়াম টমব (Clyde William Tombaugh) -কে। গ্রহটিকে দেখার পরে এর একটা নাম দিতে হবে তাই নাম চাওয়া হয়। প্রায় এক হাজার নামের ভেতর থেকে তিনটা নামকে চূড়ান্ত বাছাই করা হয়। গ্রিক/রোমান দেবতা প্লুটোর নামটাও সেই তিনটার মধ্যে ছিলো। ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড শহরের এক এগারো বছরের স্কুলছাত্রী ভেনেশিয়া বার্নি গ্রিক রূপকথায় বর্ণিত ভূতলের অন্ধকার জগতের শাসক দেবতা প্লুটোর নামে মহাকাশের মহাশীতলে বিচরণকারী গ্রহ (তখন পর্যন্ততো তাই ছিলো) -টির নাম প্রস্তাব করে। মেয়েটি ছিলো ক্লাসিক রূপকথায়

আগ্রহী একজন। তার মায়ের বাবা অর্থাৎ নানা ফ্যালকোনার মেডান (Falconer Madan) ছিলেন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির বডলিয়ান লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান। ভেনেশিয়া তাঁকে তার প্রস্তাব সম্পর্কে বলে। সেই নানা ফ্যালকোনার মেডান জ্যোতির্বিদ্যার অধ্যাপক হার্বার্ট হল টার্নার (Herbert Hall Turner)-কে বিষয়টা জানান। টার্নার সেই খবরটা আমেরিকায় তাঁর সহকর্মীদের কাছে পৌঁছে দেন। সবগুলো প্রস্তাবিত নামের মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে প্লুটো নামটিই গৃহীত হয়। ১৯৩০ সালের পয়লা মে তারিখে এটা আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষিত হয়। এরকম একটা কৃতিত্ব অর্জনের জন্য নানা মেডান তাঁর নাতনি ভেনেশিয়াকে পাঁচটি পাউন্ড দিয়ে পুরষ্কৃত করেন। সেই সময়কার সেই পাঁচ পাউন্ড আজকের দিনের (২০২১ সালে) ৩৯৪ মার্কিন ডলারের সমতূল্য। আমি ভাবি বর্তমান সময়ে এরকম একটা ঘটনার জনক বা জননীকে কর্তৃপক্ষ কীরকম আর্থিক পুরষ্কার দিতেন। নিশ্চয় তা ৩৯৪ ডলারের চাইতে অনেক অনেক বেশি হতো। বেচারি ভেনেশিয়া।

আমার খটখটে বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনার ইতি এখানেই টানছি। আমাদের পত্রিকার পাঠক পাঠিকারা পছন্দ না করলে এরকম লেখা আর দেবো না।

** উপরের রচনাটির অনেক তথ্যসূত্র ইন্টারনেট। বর্তমান জমানায় ও ভবিষ্যৎ দিনগুলোতে বিজ্ঞান বিষয়ে অনাগ্রহ থাকাটা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আমার এই লেখার একটা উদ্দেশ্য হলো খুব সীমিত হলেও এর পাঠক-পাঠিকাদেরকে বিজ্ঞান বিষয়ে কিছুটা আগ্রহী করে তোলা। মহাকাশ বলে যে বিস্ময় জগতটি রয়েছে ইন্টারনেটে ঢুকে অনেকেই সেই জগতে সহজে একটু ঘুরে আসতে পারেন। করলে আরও জানার জন্য, বোঝার জন্য আপনাদের আগ্রহ বাড়বে।*

রাজিয়া-সাহাবুদ্দিনের স্বপ্নের সংসার

প্রদীপ কুমার দত্ত
প্রাক্তন ডিজিএম
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

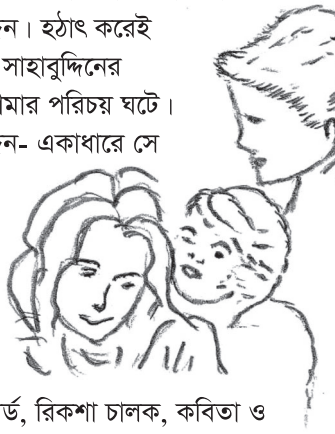

পোশাক কর্মী রাজিয়া ও তার স্বামী সাহাবুদ্দিন। হঠাৎ করেই একদিন সাহাবুদ্দিনের সাথে আমার পরিচয় ঘটে। সাহাবুদ্দিন- একাধারে সে নাইট গার্ড, রিকশা চালক, কবিতা ও গল্প লেখক। তার নিজের জীবনের গল্প দিয়েই শুরু করা যাক, কী অভিজ্ঞতা রয়েছে তার এ জীবনে!

এতদিনে করোনার প্রাদুর্ভাব আমাদের বাংলাদেশে একটু কমে এসেছে। জনগণের মাঝেও স্বস্তি বিরাজ করছে। মাঝে মাঝে টেলিভিশনের স্ক্রিনে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা এবং মৃত্যুর হার উল্লেখ থাকে। কিন্তু সাধারণের মাঝে আর আগের মতো ভয়ভীতি নেই। ইতোমধ্যে করোনার টিকাও গ্রহণ করেছে অনেকে। সেদিন মহাখালী পার হয়ে বনানী এলাকায় রিকশায় চড়ে যাচ্ছিলাম প্রাইম এশিয়া ইউনিভার্সিটিতে। রিকশা চালক সাহাবুদ্দিন। কথায় কথায় জানা গেল সে বি. এ. পাশ। দিনের বেলায় রিকশা চালায়, রাতের বেলায় একটা উঁচু ভবনের সিকিউরিটি গার্ডের চাকুরি করে। নিয়োগ চুক্তি অনুযায়ী সে প্রত্যেক দিন রাত দশটা থেকে ভোর ছয়টা পর্যন্ত নাইট গার্ড হিসাবে কাজ করে। ফলে দিনের বেলায় সকাল/বিকাল যে কোন এক টাইমে রিকশা চালাতে কোন অসুবিধা হয় না। সাহাবুদ্দিনের সাথে অল্প সময়ের মধ্যে পরিচিত হয়ে ভালো লাগলো। সে একজন খেটে খাওয়া মানুষ। শিক্ষিতও বটে। তার কাছে টাচ মোবাইল ফোন রয়েছে। সে হাল জমানার সব খবর রাখে। জিনিসপত্রের দাম কেন বাড়ে/কমে। মজুতদাররা সিন্ডিকেট করে দাম বাড়ায়, বাংলাদেশ ব্যাংকে রিজার্ভের ঘাটতি দেখা দিয়েছে, রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধের খবরও সে রাখে।

জিজ্ঞেস করেছিলাম- তুমিতো বি.এ. পাশ। তবে অন্য কোন সম্মানজনক চাকুরি না করে রিকশা চালাও কেন? তার চটজলদি উত্তর, স্যার সম্মান কেউ দেয় না। সম্মান অর্জন করতে হয়। আমি রিকশা চালাই। আমি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারি। ইচ্ছা হলে চালাই, ইচ্ছা না হলে চালাই না। একদিকে ইচ্ছা হলে যাই, ইচ্ছা না হলে যাই না। পোষালে ভাড়া নেই, না পোষালে

প্রত্যাখ্যান করি। রিকশা চালিয়ে সারাদিনে যা রুজি করি, তাতে আমার থাকা, খাওয়া, সংসারের সব খরচ মিটে যায়।

আমি রাতের ডিউটিতে যা পাই, তা আমার ভবিষ্যতের জন্য জমা করতে পারি। রাতের বেলায় ডিউটিকালিন পত্রিকা, ম্যাগাজিন পাঠ করতে পারি, আমি লেখালেখিও করি। গত একুশের বই মেলায় আমার একটা কবিতার বই প্রকাশ পেয়েছে। বইয়ের নাম- 'নবাবের গোলাম।'

সাহাবুদ্দিন নিজে নিজেই বলতে থাকে- জানেন স্যার, করোনার সময়ে খুব ভয়ে কাটিয়েছি। প্যাসেঞ্জার পেলেই মনে হতো, এই বুঝি এলো কোন করোনার রোগী।

কথায় কথায় জানতে চাইলাম- সে যে বাড়িতে নাইট গার্ডের চাকুরি করে, সেখানে ভাড়া পাওয়ার মতো কোন খালি বাসা আছে কি না? উত্তরে জানলাম, হ্যাঁ আছে। দুটো বাসা খালি আছে। আমারও একটা নতুন বাসার প্রয়োজন। তাই প্রস্তাব দিলাম, আমার একটা বাসা লাগবে। খোঁজ নিয়ে বাসা সম্পর্কে বিস্তারিত জানলাম। তিন রুম, দুই বারান্দা, দুই টয়লেট, ড্রইং-ডাইনিং স্পেস রয়েছে আলাদা। সে তার বাড়ির মালিকের টেলিফোন নম্বর দিলো।

আমি টেলিফোনে তাৎক্ষণিক মালিকের সাথে যোগাযোগ করলাম। আগামীকাল বাসা দেখানোর জন্য আমন্ত্রণ জানালো। আমিও আমার গন্তব্যে এসে রিকশার ভাড়া চুকিয়ে নেমে গেলাম। এক কথা দুই কথায় সাহাবুদ্দিন আমাকে তার মালিকের বাড়িতে যেন ভাড়া নিয়ে থাকতে পারি- সেজন্য, সে খুব জোর সুপারিশ করেছে।

পরদিন মহাখালী ওয়্যারলেসের বিপরীতে তার দেওয়া ঠিকানা মতো পৌঁছে গেলাম। বাড়ির মালিকও উপস্থিত ছিলেন। আমি যাবো বলে সাহাবুদ্দিন নিজেও ওই বেলায় বাড়িতেই ছিলো। বাসা পছন্দ হয়েছে তাই- সাথে সাথে বাসা ভাড়ার শর্ত মেনে পাকা কথা দিয়ে ফিরলাম।

সামনের মাসে এক তারিখে তিন মাসের সমপরিমাণ অগ্রিম ভাড়া দিয়ে উঠতে হবে। উভয়পক্ষই রাজি। বাড়িভাড়া ছাড়াও দারোয়ান, পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ এসব আমাকে বহন করতে হবে। এগুলোও দিতে রাজি হলাম। সময়মতো অগ্রিম টাকা বুঝিয়ে দিয়ে মাসের এক তারিখ থেকেই নতুন বাসায় উঠে গেলাম। নতুন বাসায় উঠতে সাহাবুদ্দিন তার আরকে সহকর্মীকে সাথে নিয়ে আমার বাসা স্থানান্তরের প্রক্রিয়ায় আগ্রহভরে আমাকে সমস্ত মালামালসহ উঠাতে সাহায্য করেছে। নিজে নিজেই ভারী ফার্নিচার, আসবাবপত্র, বয়ে উঠিয়েছে। আমি তাকে কিছু বখশিসও দিয়েছি। সেও খুব খুশি। সাহাবুদ্দিন ওই বাড়ি সংলগ্ন পৃথক আস্তানায় শিশুসহ তিনজন থাকে, তার স্ত্রী ও এক মেয়ে।

সাহাবুদ্দিনের স্ত্রীও এক গার্মেন্টসের কর্মী। তার নাম রাজিয়া। রাজিয়া প্রত্যেকদিন তার তিন বছরের শিশু কন্যাসহ কারখানায় চলে যায়। সেখানেই বাচ্চা রাখার জন্য

ফ্যাক্টরির ব্যবস্থাধীনে ডে-কেয়ার রয়েছে। আরও অনেক বাচ্চা আছে সেখানে। বাচ্চারা একসাথে খেলে, স্নান করে, খায়, টিভি দেখে এবং একই সময়ে ঘুমায়। ছুটির সময় মায়েরা নিজ নিজ সন্তানকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে যায়। এদেরকে দেখার জন্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দুজন আয়া আছেন।

রাজিয়াও যে বেতন পায়, তাতে সে খুব খুশি। গার্মেন্টসের মালিকের উপরও সে সন্তুষ্ট। ভালো বেতন পায়, এছাড়া বাড়তি সুবিধাও আছে। সাবসিডাইজড ক্যান্টিন ফ্যাসিলিটিজ, ওভার টাইম, হাজিরা বোনাস, অর্জিত ছুটির ক্যাশ বেনিফিট, ফেস্টিভাল বোনাস, উৎপাদন বোনাস, গ্রাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, ইত্যাদি সব রকম সুবিধা রয়েছে। রাজিয়াও মাসে মাসে তার অর্জিত টাকা সংসারের খরচ মিটিয়ে কিছু উদ্বৃত্ত টাকা জমা করে।

সাহাবুদ্দিন আর রাজিয়া দম্পতির একমাত্র ভবিষ্যৎ চিন্তা তাদের মেয়ে সোমাকে ঘিরে। সে বড় হবে, লেখাপড়া করবে, পড়াশুনা করে ডাক্তার হবে। রাজিয়া শুনেছে তাদেরই এক সিনিয়র অপারেটর জুলেখা আপার মেয়েও ডাক্তারি পড়ছে। এ বিষয়টা জানার পর থেকেই তার মনে এক চিন্তা মাথায় ঢুকেছে- মেয়ে তার কবে বড় হবে? লেখাপড়া শিখে ডাক্তার হবে।

গার্মেন্টসে চাকুরি নেওয়ার আগেই রাজিয়ার সাথে সাহাবুদ্দিনের পরিচয় হয়। একজন আরেকজনকে ভালোবাসে, পরিণতিতে বিয়ে হয়। তারপর সাহাবুদ্দিন রাজিয়াকে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে ঢাকায় চলে আসে। রাজিয়া গার্মেন্টসে প্রথম প্রথম যখন হেলপার হিসেবে চাকুরি নেয়, তখন সহকর্মীরা তার স্বামী রিকশা চালায় শুনে মুখ টিপে হাসতো আর বলতো- দেখবি কয়দিন পরে তোর জামাই তোকে ছেড়ে আর একটা বিয়ে করে নতুন সংসার পাতবে। শুনে খুব দুঃখ পেতো মেয়েটা। কিন্তু এতদিনের সংসারে এদের ভাঙন ধরেনি। বরং দিনে দিনে ওরা আরও বেশি দায়িত্বশীল আচরণ করেছে। উভয়ের মধ্যে একটাই চিন্তা, যে করেই হোক মেয়েটাকে মানুষ করতে হবে।

রাজিয়া একদিন হঠাৎ ফ্যাক্টরিতে যেতে পারেনি। তার মেয়ে সোমার উচ্চ মাত্রায় জ্বর। ডাক্তার, ঔষধ, মেয়েকে খাওয়ানো, যত্ন করা সব মিলিয়ে একটা উদ্বেগজনক অবস্থা। বাসার পাশেই একটা ঔষধের দোকান। তাদের জিজ্ঞেস করেই নাপা-এক্সট্রা ঔষধ খাওয়ায় মেয়েকে। পরের দিন ফ্যাক্টরির ডাক্তারকে দেখিয়েছে। কিন্তু আজও ডিউটিতে যোগ দিতে পারেনি। ফ্যাক্টরির ডাক্তার এবং ঔষধ ফ্রি। কিন্তু চিন্তা আরেক জায়গায়, অনুপস্থিত থাকলে, উপস্থিতি বোনাস পাবে না। ওভার টাইম কমে যাবে। মাসের শেষে আয় কমে যাবে। রাজিয়া সবার কাছে দোয়া চায়, তার মেয়ে যেনো শীঘ্রই সুস্থ হয়ে যায়। তাহলে সে দ্রুত কাজে যোগ দিতে পারবে।

কিন্তু রাজিয়ার দুর্ভাগ্য, তার মেয়ে ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হয়েছে বলে ডাক্তার জানিয়েছে। কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা দিয়েছে, ঔষধের ব্যবস্থাপত্র দিয়েছে। আর কোন

একটা বড় হাসপাতালে ভর্তির জন্য রেফার করেছে। রাজিয়া কী করবে ভেবে পায় না। কিন্তু তার ফ্যাক্টরির এইচআর বিভাগের কর্মকর্তাগণ এ ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন। টাকা লাগলে কর্মচারী কল্যাণ ফান্ড থেকে নেয়া যাবে। ছুটির ব্যবস্থা করা হয়েছে। তার পরিবারের কাছের লোকজন বা আত্মীয়-স্বজনের চেয়েও অধিক মাত্রায় সাপোর্ট পেয়েছে ফ্যাক্টরির সহকর্মী, কর্মকর্তাবৃন্দের কাছ থেকে। কেউ কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রক্ত দিতেও এগিয়ে এসেছে। এ সব কিছু রাজিয়ার ফ্যাক্টরি থেকেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সপ্তাহ খানেক পর হাসপাতাল থেকে রাজিয়ার মেয়ে সোমা রিলিজ পেয়েছে। এখন সে সম্পূর্ণ সুস্থ। রাজিয়াও ফ্যাক্টরিতে কাজে যোগ দিয়েছে।

সাহাবুদ্দিন তার নিজের জীবনের গল্পটা এভাবেই লিখেছে। কথায় কথায় একদিন সাহাবুদ্দিন আমাকে জানালো- স্যার, আমার নিজের জীবনের গল্পটা শেয়ার করলাম। আমার স্ত্রী গার্মেন্টসে চাকুরি করে বলেই কি না আমাদের শত অভাব অনটনের মধ্যেও আমরা খেয়ে পড়ে খুব ভালো আছি। এমনিভাবে রাজিয়া-সাহাবুদ্দিনের মতো সংসারগুলো আজ আর্থিকভাবে সচ্ছল এবং ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখে। আমার স্ত্রী গার্মেন্টসের কর্মী, এটা আমার গর্ব, এটা আমার অহংকার। এটা সাহাবুদ্দিনের স্বগতোক্তি।

সাহাবুদ্দিনের লেখা একটি কবিতা-

মানুষের জয়

অতিমারির ছোবলে ধরা হয় ধরাশায়ী
নামটি তার করোনা
সারা পৃথিবী দাপিয়ে বেড়ায়
কেউ বুঝে উঠতে পারে নাই এর ছলনা।
বারে বারে আছড়ে পরে
মানে না কোনো শাসন বারণ,
কোটি কোটি মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে
অপ্রতিরোধ্য তার আক্রমণ।
গনজাগরণে প্রতিরোধ গড়ার
চেষ্টা হয় বারে বারে।
তাইতো আমরা মাস্ক পড়ি
হাত ধুই, নিজেকে রাখি দূরে দূরে।
স্কুল-কলেজ বন্ধ হয় দ্রুত
এ বন্ধ চলে মাসের পর মাস অবিরত।
পরিশেষে, চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের বিরামহীন চেষ্টায়
ভ্যাকসিন আবিষ্কার হয়।
করোনার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী
এতে নেই কোন বিস্ময়!
বিজ্ঞানের জয় এটা, মানুষেরই জয়।

রাজিয়া এখন বন্ধুদের সাথে গর্ব করে বলে বেড়ায় তার স্বামী শুধু রিকশা চালক, সিকিউরিটি গার্ডই নন। তার স্বামী একজন কবিও বটে।

জাগরণ

সজীব কুমার
জুনিয়র অফিসার, লজিস্টিকস
ব্যাবিলন গ্রুপ

আমি উন্মাদ নই, বিদ্রোহী।
রক্তিম ছায়াতলে করতে পারি রক্তের গোসল
তবু, যদি হয় বিবেকের উন্মোচন।

মমতাময়ী ধরণির ছায়াতলে
রবে না কোনও অন্যায়ের আঁচল।
ন্যায়, অন্যায় আমি বুঝি না
বুঝি শুধু বিবেকের উন্মোচন।

পরাধীনতায় মোড়া বিবেক, আমি চাই না
সূর্যের ন্যায় জ্বলন্ত এক শিখাময় প্রদীপ
এ যেন শুধু মানবের নয়,
সারাবিশ্ব এরই অপেক্ষায়...

ধ্বংসযজ্ঞে উঠব মেতে
তুলব করে এই পৃথিবী আবারও বিষাদময়
নৃশংস হত্যাযজ্ঞে উঠব আমি মেতে
তাল হারিয়ে হয়ে যাবে সব বেতাল
এ যেনো এক বিদ্রোহ নয়,
উদ্দীপ্ত বিবেকের উন্মাদনায় মাতাল।

বৃষ্টি

মো. আসাদুজ্জামান আশিক
অফিসার, ক্যাড অ্যান্ড প্যাটার্ন
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

আকাশটা আজ ডাকছে ভীষণ
পাচ্ছো কি তুমি ভয়,
এমন সময় দূরেতে নয়
কাছেতে থাকতে হয়।

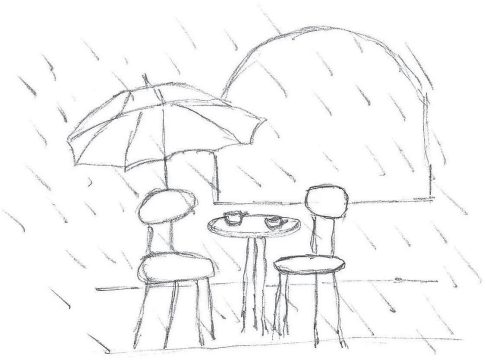

আকাশটা আজ অভিমানী
কালো মেঘের বিচরণ,
বৃষ্টি হবে যখন তখন,
আরও থাকো কিছুক্ষণ।

বৃষ্টির জল ঝিরি ঝিরি
পড়ছে টিনের চালে,
পাখিরা সব ভেজা গায়ে
বসে আছে ডালে।

চায়ের কাপে তোমার আমার
বৃষ্টি দেখার সাধ,
হাসবে তুমি দেখবো আমি,
ভাঙবো প্রেমের বাঁধ।

মনে পড়ে কি প্রথম যেদিন
দেখেছি তোমার বৃষ্টি ভেজা চুল,
প্রেমে পড়িয়া মুগ্ধ হয়েছি
মন দিতে করিনি ভুল।

কত ভালোবাসা কত প্রেম আহা
জমে ছিল মোর দিলে,
কত ঘুরাইয়া কত পেঁচাইয়া
আপন করিয়া নিলে।

আকাশের বুকে উড়ছে পাখি
নাই যে তাদের মানা,
আমার মনের আকাশ জুড়ে
মেলেছো তুমি ডানা।

কখনো যদি আঁধার এসে
নিভিয়ে দেয় আলো,
সেদিনও যেন হাসি মুখে
ভালো আছি বলো।

সময় এখন

মো. নূর ইসলাম
সিনিয়র অফিসার, গ্রাফিক্স
ব্যাবিলন আউটফিট লিমিটেড (ট্রেন্ডজ্)

সময় এখন আম কাঁঠালের
সময় এখন লিচুর
সময় এখন তেল ও গ্যাসের
আরও অনেক কিছুর।

সময় এখন ময়দা আটার
সময় এখন গোসের
সময় এখন মাছ বাজারের
পরিবহন কোচের।

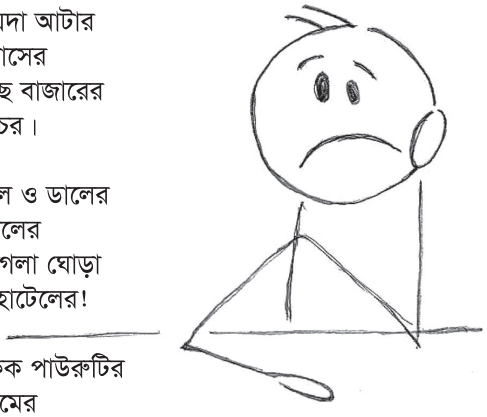

সময় এখন চাল ও ডালের
সময় এখন খেলের
সময় এখন পাগলা ঘোড়া
মেস মালিক হোটেলের!

এখন সময় কেক পাউরুটির
এখন সময় ডিমের
এখন সময় দেশের টাকা
পাচারকারী টিমের।

সময় এখন মজুতদারির
সময় এখন নেতার
সময় এখন মুখোশধারী
ধর্মদ্রোহী হোতার।

সময় এখন উল্টো হাওয়ার
সময় এখন চোরের
সময় এখন মিথ্যাবাদীর
সময় নেশা খোরের।

প্রতিজ্ঞা শপথ

মোছা. মমিনা বেগম
সিনিয়র অপারেটর, সুইং
অবনী ফ্যাশন্স লিমিটেড

নিজের পায়ে চলব বলে শপথ করেছি,
নিজের ডানায় উড়ব বলে পাখনা মেলেছি।
দেশবাসি সবার কাছে চাই সকলের দোয়া,
ভয় করি নাকো, মোদের সাথে আছে ব্যাবিলনের ছায়া।

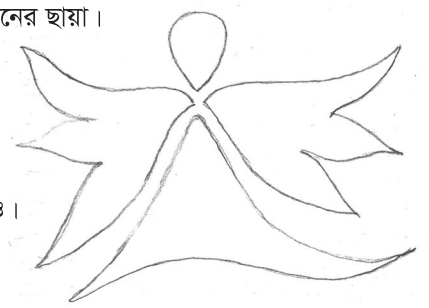

হাত, পা, সবই আছে পাব কেন ভয়?
কর্মের দক্ষে ভাগ্যের চাকা হতেই হবে জয়।
পেশী শক্তি না দেখিয়ে ইচ্ছে শক্তি করো,
জয় এক দিন হতেই হবে যতই আসুক ঝড়ও।

যতই বিপদ আসুক তবে রাখব বিধির স্মরণ,
তাহার উসিলাতে আছে মোদের সোনার ব্যাবিলন।
নিজের পায়ে চলব বলে শপথ করেছি,
নিজের ডানায় উড়ব বলে পাখনা মেলেছি।

মানসিক স্বাস্থ্য কে দেখবে?

সাব্বির আহমেদ
গ্রুপ সিএফও
ব্যাবিলন গ্রুপ

প্রথম বক্তা ঃ
‘ছেলেটাকে নিয়ে আর পারলাম না। খালি খেলার নেশা, পড়ালেখা করবে কখন? স্কুলে মনে হয় খেলার জন্যই যায়। স্কুল শেষে কোথায় তাড়াতাড়ি বাড়ি আসবে, তা না, ওকে প্রতিদিন এক ঘণ্টা খেলতে দিতে হবে।’

দ্বিতীয় বক্তা ঃ
মা এতটুকু খেলতে দেবে না! বিকেল বেলায় আমি খেলতে যাবো, কিন্তু না, সেই সময়টা কোচিং দিয়ে রাখবে। আমার আর সময় কোথায়? আমি বন্ধুদের সাথে খেলবো কখন?

আমাদের বাবা-মা চরিত্রগুলো এতটাই প্রভাব বিস্তারকারী যে, সন্তানদের ইচ্ছেগুলো আমাদের কানে পৌঁছায় না। সন্তানদের চাওয়াগুলো অন্যায় আবদার বলে মনে হয়। বাবা-মায়েরা সন্তানদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করার প্রচেষ্টায় সাধারণত কোনো কমতি রাখেন না। তবে তুলনামূলকভাবে শারীরিক স্বাস্থ্য নিয়ে মনোযোগটা কম থাকে আর মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়টা বেশিরভাগ বাবা-মায়ের এজেন্ডার মধ্যেই থাকে না। এখানে বলে রাখা ভালো, শারীরিকভাবে সুস্থ বলতে আমরা কোন অসুখ নেই এতটুকুই বুঝি। কিন্তু শারীরিক সুস্থতার ব্যপ্তিটা আরো বড় যেটা মধ্যবয়সে আসলে বোঝা যায়।

ব্যক্তিত্ব, এটিচিউড এই শব্দগুলোর মুখোমুখি হই, যখন আমরা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করি, আমরা তখন বুঝে উঠতে পারি না, এটিচিউড বিষয়টা কী! বাবা-মা বুঝে উঠতে পারেন না এত ভালো রেজাল্ট করা সন্তান কেন কর্মক্ষেত্রে সফলতা পাচ্ছে না। ভিন্ন-ভিন্ন মানুষ একই পরিস্থিতিতে ভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখায়, আমার সংজ্ঞায় সেই ভিন্ন প্রতিক্রিয়াই তার এটিচিউড।

একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব, এটিচিউড বা মানসিক স্বাস্থ্য তৈরি হয় তাঁর শিশু-কিশোর বয়সে। তবে মানসিক স্বাস্থ্য তৈরি করার প্রক্রিয়াটা কি? এই মানসিক স্বাস্থ্য তৈরি করার প্রক্রিয়াটা চলতে থাকে যখন সন্তানরা খেলাধুলার মধ্যে থাকে। আমরা ভেবে থাকি খেলাধুলার প্রয়োজন শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য। প্রকৃতপক্ষে খেলাধুলা

মানসিক স্বাস্থ্য তৈরি করে যেখানে শারীরিক স্বাস্থ্য একটি উপযোগ মাত্র।

আমাদের ছেলেটা যখন প্রতিদিন মাঠে খেলা করতে যায়, সে কখনও বাড়ি ফিরবে খেলায় জিতে অথবা হেরে। খেলায় হেরে তার মনটা খারাপ হয়, কিন্তু সে জানে আগামীকাল একটা নতুন দিন আসবে সেখানে তাকে জিততে হবে। জয়ী হলে কী করতে হবে এটা সহজাতভাবে আমরা জানি, কিন্তু হেরে গেলে কী করতে হবে এই প্রশিক্ষণ পাবে যখন সে খেলতে মাঠে যাবে। হেরে যাওয়ার শিক্ষাটা কর্মজীবনের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ যেটা আমাদের স্কুলের বই, হয়তোবা গল্প-উপন্যাসের বইও দিতে পারবে না। হেরে যাওয়ার প্রশিক্ষণ ছাড়া যখন আমরা জীবিকার প্রতিযোগিতায় নামি তখন আমরা হারটাকে মেনে নিতে পারি না আর এটাও জানি না সেই পরিস্থিতিতে কী করতে হবে?

প্রতিটি খেলার বেশ কিছু নিয়ম আর রীতি থাকে, খেলোয়াড়কে সেই নিয়ম-রীতি মেনেই খেলাটা খেলে যেতে হয়, অন্যথা হলে তাকে খেলা থেকে বের করেও দেওয়া হয়। নিয়মিত খেলাধুলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমেই শিশু-কিশোর বয়স থেকে শৃঙ্খলা আর নিয়মানুবর্তিতার প্রশিক্ষণ হয়ে থাকে। এই শৃঙ্খলাবোধ জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে সাফল্যের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে থাকে।

খেলার মধ্যে আমরা দেখে থাকি, কীভাবে দলের সব সদস্য একজন সতীর্থের সাফল্য উদযাপন করে। শুধু তাই নয়, কখনো কখনো প্রতিপক্ষ দলের সেরা খেলোয়াড়ও সেই সম্মানটি অর্জন করে নেয়। নিয়মিত খেলাধুলার চেষ্টা, শিশু-কিশোর বয়স থেকেই অন্যের অর্জনকে সম্মান করতে, সেরাটাকে সম্মান করতে শেখায়। এই শিক্ষাটা হয়তো আমরা আমাদের সন্তানদের দিতে পারবো। কিন্তু প্রশিক্ষণের জন্য তাকে মাঠেই পাঠাতে হবে। নিয়মিত খেলাধুলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিশুরা ছোটোবেলা থেকেই সময় ব্যবস্থাপনার প্রতি মনোযোগী হয়। সে শিখে ফেলে তার দৈনন্দিন পড়ালেখার আঁটসাঁট রুটিন এর মাঝেও কীভাবে সময় বের করে নিয়ে তার অত্যন্ত পছন্দের কাজগুলো করতে হয়।

আমি আমার লেখাটা শুরু করি একটা ছেলে সন্তানের খেলাধুলার আকুতির জায়গা থেকে। তাহলে কি আমরা আমাদের মেয়েদের খেলাধুলা নিয়ে ভাবতেই পারি না? আসলেই তাই - আমরা এখনও নিজেদের সাথে মীমাংসা করতে পারিনি যে আমার কিশোরী মেয়েটাকে মাঠে খেলতে পাঠাবো কি না, তার খেলোয়াড়ি পোশাক কী হবে, আমাদের আশেপাশের মানুষগুলো আমার মেয়ের খেলাটাকে কীভাবে নেবে, মেয়েদের খেলার মাঠ কোথায়, মেয়েটাকে বাইরে পাঠানো নিরাপদ কি না, তাকে মাঠে খেলতে দিলে গায়ের রংটা কালো হয়ে যাবে কি না, ইত্যাদি।

আমাদের বুঝতে হবে, আমরা হয়তো এখন মেয়েটার পড়ালেখার সুযোগ ছেলেটার সমান অথবা প্রায় সমান দিচ্ছি, কিন্তু শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সমান সুযোগই এখানে যথেষ্ট না। ছেলেটাকে

নিয়মিত খেলাধুলার সুযোগ করে দিতে হবে, একই সুযোগ মেয়েটার জন্যও রাখতে হবে।

আমরা আমাদের সন্তানদের জন্য এমন একটা ভবিষ্যৎ চাই, যেখানে তারা উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হবার সাথে সাথে বলিষ্ঠ চরিত্র এবং সুস্থ শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী হবে।

কিছু স্মৃতি, কিছু গল্প আর কিছু হাসি

আয়েশা সিদ্দিকা আরজু
এক্সিকিউটিভ-ওয়েলফেয়ার, এইচআর অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স
অবনী ফ্যাশন্স লিমিটেড

"ব্যাবিলন কথকতা" আট বছর ধরে তাকে চিনি। কথকতা কিছু মানুষের আবেগের অংশ। বছরের কিছু নির্দিষ্ট মাস আর নির্দিষ্ট সময় এর পিছনে ব্যয় করতে মন্দ লাগে না। হরেক রকম লেখা, হরেক রকম অভিজ্ঞতার সাথে পরিচয় হয়। বার বার পিএ সিস্টেমে ঘোষণা দেয়া 'লেখা জমা দিন,' কারো কারো কাছে গিয়ে বলা 'লেখা জমা দিন।' লেখা জমা হয়, যাচাই বাছাই হয়, তারপর মানসম্মত হলে কথকতার বুকে ঠাঁই হয়। যান্ত্রিক এই জীবনে এমন কিছু করার কথা ভাবতে চাওয়াটাও বাড়াবাড়ি। কথকতা হলো নিজেকে জানার উপযুক্ত একটি মাধ্যম। লেখার আগে ভাবতে হয় - "কী লিখবো?" - লেখার পরে ভাবতে হয় "ছাপবে তো?" ছাপার পর আরেক চিন্তা, "পুরস্কার পাইলেতো মন্দ হয় না!"

ব্যাবিলন পরিবারের সাথে যুক্ত হবার প্রথম বছর থেকেই কথকতার সাথে যুক্ত আমি। প্রতি বছরই আমার লেখা কথকতায় ছাপা হয়েছে। লাস্ট দুইটি সংখ্যায় বিভিন্ন কারণে লেখা জমা হয়নি। যাই হোক, এবার ভাবছি লেখবো। আর আমি আসলে কবিতা লিখতে পারি না। উপন্যাস, গল্প, ইত্যাদি লিখতে সাচ্ছন্দ্য বোধ করি। তবে এবার ভাবছি ভিন্ন কিছু লেখি।

ইট-কাঠ আর পাথরের এই শহুরে জীবনে আমরা এতটাই ব্যস্ত যে, মন খুলে হাসতে গিয়ে ও বারবার ঘড়ি দেখি। কেউই যেন মন আর প্রাণ ভরে হাসতে পারি না। তাই এবারের কথকতায় আমি সবাইকে হাসাতে চাই। অন্তত ততক্ষণ, যতক্ষণ লেখাটি শেষ না হবে।

আমার এই লেখার বেশিরভাগ কথাগুলো আমার জীবনের বিভিন্ন সময়ের অভিজ্ঞতা থেকে নেয়া, এই লেখার চরিত্রগুলো কিছু বাস্তব, কিছু কাল্পনিক।

স্কুল ফাঁকি দিয়ে মাছ ধরা-

ক্লাস সিক্সে পড়ি। স্কুল ড্রেস পরে কাঁধে বই ভর্তি ব্যাগ নিয়ে স্কুলের উদ্দেশে বের হয়েছি। প্রতিদিন স্কুলে পৌঁছে দেয়ার জন্য আব্বা একটা রিকশা ভাড়া করে দিয়েছিলেন। সোজা রাস্তায় গেলে মাত্র দশ মিনিট লাগতো স্কুলে পৌঁছাতে, কিন্তু আমি সোজা রাস্তায় যাবার পাত্রী ছিলাম না। রিকশাওয়ালা দাদু (একটু বয়স্ক তাই দাদু

ডাকতাম) কে বলতাম ঘুরে ঘুরে চিপাচাপা রাস্তা দিয়ে যেতে। কারণ তাকে বেশি ভাড়া দেয়া হতো। দাদুও তাই করতেন। একদিন, স্কুলে যাবার সময় দাদু যখন অন্য একটি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন দেখলাম এলাকার চেয়ারম্যানের পুকুরের কাছে অনেক লোকের ভিড়। দাদুকে রিকশা থামাতে বললাম। দাদু বললেন, "তুমি স্কুলে যাইবা না।" আমি বললাম "যাবো তো, এখনও সময় আছে আপনি দাঁড়ান। দেখি কী হইছে।" নেমে সামনে গিয়ে দেখি পুকুর সেঁচছে। সবাই দল বেঁধে মাছ ধরছে। সেইটা সমস্যা না। সমস্যা হলো আমার বান্ধবীরা, ভাইয়া আর ভাইয়ার বন্ধুরাও আছে সেখানে। আমাকে আর কে পায়! পা থেকে জুতা মোজা খুলে, ব্যাগটা দাদুর কাছে দিয়ে এক দৌড়ে পুকুরের কাদার মধ্যে নেমে গেলাম। ভাইয়া আমাকে বার বার বলছিলো "আরজু বাসায় যা, মা আসলে কিন্তু তোর খবর আছে। তোর লাইগা আমিও মাইর খামু।" কে শোনে কার কথা, আমি যেন তখন আমার ভাইকেই চিনি না। মজা করে মাছ ধরছি। যদিও একটা পুঁটি মাছ ছাড়া আর কিছুই পাইনি। মোটামুটি আধা ঘণ্টা পর আমার পিঠাপিঠি ছোট ভাই দৌড়াতে দৌড়াতে এসে বললো, "আপা তাড়াতাড়ি পলা (পালিয়ে যা), মা আসতেছে।" বলতে না বলতেই পিঠের মধ্যে চিকন একটা বাড়ির আঘাত পেলাম। পিঠটা বাঁকা করে আঘাতের জায়গাটা হাত বোলাতে বোলাতে একরকম ছাগল নৃত্য শুরু করলাম। পুকুরের পাড়ও খুঁজে পাচ্ছিলাম না উঠে দৌড় দেয়ার জন্য। মা যে জায়গাটিতে দাঁড়ানো একমাত্র ওই জায়গাটা নিচু। মা মা করে পিঠ ডলছি (আসলে লাঠির বাড়িটা এতটা লাগেনি যতটা দেখাচ্ছিলাম) আর উপরে উঠার চেষ্টা করছিলাম। মা আমার দুই বেণি করা করা চুলের একটি খপ করে ধরলো, আর গরুর মতো টানতে লাগলো। আর আমি নিজেকে ছাড়ানোর জন্য হাত পা ছড়িয়ে নিচে বসে পড়লাম। ওই অবস্থাতেই মা আমাকে টানতে লাগলো। আমিও মাইরের হাত থেকে রক্ষা পেতে 'মা, আর করুম না, আর করুম না' বলছিলাম, আর ঘাস-লতা-পাতা-মাটি যা আছে খামছে খামছে ধরছিলাম। আর পিছনে তাকিয়ে দেখছিলাম ভাইয়া আসতেছে কিনা। দেখলাম আমার ভাইয়ারাসহ ওর বন্ধুরা আর আমার বান্ধবীরা সব যে যেদিকে পারছে দৌড়ে পালাইতেছে। বাসায় পৌঁছাতে পৌঁছাতে আশেপাশের আন্টিরা মাকে বলছিলেন, "ভাবি ছাইড়া দেন, ছাইড়া দেন।" কে শুনে কার কথা, বাসায় নিয়া....থাক তা আর নাই বললাম। তবে তারপর থেকে আর স্কুল মিস দিইনি।

আমার পিয়নগিরি-

এলাকার বড় আপু প্রেম করেন তাদেরই বাড়িওয়ালার ছেলের সাথে। তাদের প্রেমের চিঠি আবার আদান-প্রদানের দায়িত্বটা পালন করতাম আমরা তিনজন, আমি, সোমা, আর ছনিয়া। প্রতিদিন দুইটা দুইটা চারটা চিঠি আদান প্রদান হতো। বড় আপুর প্রেমিক, এলাকার চেয়ারম্যানের ছেলে। আমাদের এলাকায় তাদের বড় একটি বাগানবাড়ি আছে। এমন কোন ফলের গাছ নেই, যা সেখানে ছিলো না। চিঠি আদান প্রদানের বিনিময়ে সেই

বাগানে প্রবেশাধিকারসহ ইচ্ছেমতো ফলফলাদি খাবার অনুমতি পেয়েছিলাম। আর প্রতি ঈদের আগের দিন স্পেশাল ঈদ কার্ড পেতাম দুইজনের পক্ষ থেকেই। একদিন সন্ধ্যায়, আপু আমাদের বাসায় এলেন। এসেই অগ্নিমূর্তি হয়ে আমাকে বলছেন "তোকে আমি ছোটবোনের মতো ভালোবাসি। কত আদর করি তোকে, আর তুই কিনা আমার সাথে এতবড় বেইমানিটা করলি?" আব্বা বাসায় ছিলেন। এই সময় আপু এসে আমাকে এভাবে শাসাচ্ছে দেখে আব্বা মা সাবাই আপুকে জিজ্ঞেস করছিলো 'কী হয়েছে?' এদিকে আমারতো জানে পানি নাই। আব্বা যদি জানতে পারে আমি পিয়নের কাজ করি তাইলে আজকে আমার রক্ষা নাই। আপুকে বললাম "আমি কী করছি?" 'তুই কী করছোস?' ন্যাকামি করবিনা। এই তোদের প্রতি ঈদের আগে চাঁদ রাতে আমরা দুইজন একসাথে ঈদকার্ড দেই। আজকে তোকে একা এসে ঈদকার্ড আর চিঠি দিয়া গেলো তুই কিছু কস নাই ক্যান? চিঠি আর কার্ড একসাথে দিলো তুই আমারে বললি না ক্যান?" আমি শান্তভাবে আস্তে করে বললাম, 'ভাইয়া বলছে আপনি অসুস্থ, তাই আসেননি, আর সোমা-ছনিয়ারটাও বাসায় দিয়ে আসছে। আমাকে বলছে "তোমার আপুকে আজকে চিঠি দেয়ার দরকার নাই। এটা তোমার জন্য।" তাও তো আমি চিঠি দিয়ে আসছি; কার্ড রেখে দিয়েছি। আমি এখনো দেখিও নাই।' আপু আরো ক্ষেপে গেলেন। আব্বা মা'র সামনেই আমাকে বললেন "থাপড়াইয়া তোর গাল ফাটামো ফাজিল।" এতক্ষণ আব্বার ভয়ে কিছু বলছিলাম না। কিন্তু এবার আমিও রেগে গেলাম। বললাম "আপু আপনাকে সম্মান করি, তাই এতক্ষণ চুপ ছিলাম, তাই বলে আপনি এমন অস্বাভাবিক আচরণ কেনো করছেন? কোন কিছু না বুঝে যা ইচ্ছে তাই বলে যাচ্ছেন কোনো?" এবারে আপু একটু ঠান্ডা হলেন। হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা আমার হাতে দিলেন। চিঠি পড়ে তো আমারই হাই প্রেসার হয়ে যাবার অবস্থা। চিঠির মাঝ বরাবর একটা লাভ চিহ্নের ভিতরে বাংলায় লাল কালিতে লেখা "ভালোবাসি" আর পুরো পাতা জুড়ে বিভিন্ন কালি দিয়ে আরজু, আরজু, আরজু.....এতক্ষণে বুঝলাম আপুর রেগে যাওয়ার কারণ। এরপর থেকে আর ফল খেতে বাগানে যাওয়া হয়নি।

ব্যথা পাই নাই-

আমরা সাত বান্ধবীর এক গ্রুপ ছিলাম। সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিকে আমাদের গ্রুপটা ছিলো কুখ্যাত। যেদিকে যাবো, যা করবো সব একসাথে। আমাদের শারীরিক বিদ্যার স্যার আমাদের নাম দিয়েছিলেন সপ্তর্ষি। যাই হোক কথা তা না, কথা হলো সাভার থেকে আমরা ছয় বান্ধবী একসাথে বাসে যেতাম। যে বাসে আমরা আছি সেই বাসের বাকি যাত্রীদের অবস্থা-কানে তুলো দিয়ে রাখতে পারলে ভালো হতো আর কী। আর ছয়জনকে যেভাবেই হোক একসাথে বসতে হবে, তাই একেবারে পিছনের সিটে গিয়ে বসতাম। কারণে অকারণে হাসতে হাসতে মানুষের বিরক্তি ধরায়া দিতাম। একদিন আমরা সবার পিছনে মাত্র চারটি সিট পেলাম বসার জন্য। দুই পাশের সিটে দুই জন ভদ্রলোক বসলেন আর আমি একপাশে, আমার

পাশে সাবিহা আর সাহনাজ। সাবিহা একদম মাঝখানে বসায় ধরার মতো কোন কিছু ছিলো না। তাই গাড়ি ব্রেক করলে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কাউকে না কাউকে খামছে ধরতো। যে ভদ্রলোককে ধরছিলো তিনি ডেইরি ফার্মে গিয়ে নেমে গেলেন। সাহনাজ আর আমি দুই পাশ থেকে ওকে ধরে রাখলাম। হঠাৎ করে গাড়ি এত জোরে ব্রেক করলো তাল সামলে না রাখতে পেরে সাবিহা পড়ে গিয়ে সোজা বাসের চার সারির কাছে চলে গেলো। মনে হচ্ছিলো ও যেন স্লিপারে বসেছিলো। বেচারি পড়ে গিয়ে অত দূর চলে গিয়ে উঠে ইউনিফর্ম ঝাড়তে ঝাড়তে বলতে লাগলো 'ব্যথা পাই নাই।'

Bangladesh is a land of rivers (বাংলাদেশ একটি নদী মাতৃক দেশ)-

একদিন ইংরেজির টিচার আসেননি। স্যারের পরিবর্তে ক্লাস নিতে এলেন বাংলার টিচার। তিনি আমাদের বললেন "ইংরেজি স্যার কী পড়া দিয়েছেন আজকে?" বললাম স্যার parts of speech. স্যার বললেন "খুব ভালো, তাহলে স্যারের পড়া থাক, তোমরা এক কাজ করো, সবাই ইংরেজিতে প্যারাগ্রাফ লেখো। বিষয় হলো বাংলাদেশ একটি নদী মাতৃক দেশ। আর হ্যাঁ কেউ কারোটা দেখে লিখবে না"। আমার বান্ধবী কণা, ফিসফিস করে আমাকে বললো, "দোস্ত দেখাইস"। আমি লেখা শুরু করলাম। হেড লাইন দিলাম, Bangladesh is a land of rivers. কণা ও তাই লিখলো, যা আমি লিখলাম। স্যার আবার খেয়াল করলেন বিষয়টা, কণাকে বললেন, "এই মেয়ে তুমি পিছনে যাও।" কণা বাধ্য মেয়ের মতো পিছনে চলে গেলো। মিনিট দশেক পর স্যার বললেন, "এই আরজু সবার খাতা জমা নাও আর লেখা লাগবে না।" আমি সবার খাতাগুলো তুললাম। কণার খাতাটা দেখে মন ভালো হয়ে গেলো। যাক কণা খাতা ভর্তি করে সুন্দর করে একাই ইংরেজি প্যারাগ্রাফ লিখতে পেরেছে। স্যারের টেবিলে নিয়ে খাতাগুলো রাখলাম। স্যার খাতাগুলো সব উল্টা দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। অর্থাৎ-উপরের খাতাগুলো নিচে আর সবার নিচের খাতা উপরে। সবার আগে তাহলে কণার খাতা পড়লো। কণার খাতাটা হাতে স্যার বলতে লাগলেন,

'কি প্যারাগ্রাফ লিখিয়াছো কন্যা, নামটি তোমার কণা,
আমার পানে কেন চাহিয়া আছো, তুলিয়া সর্প ফণা,
নদী মাতৃক বাংলাদেশ, হইয়া গেছে সাগর,
যেমন তোমার হাতের লেখা, তেমনি তোমার রচনা,
কণা, ও কণা...'

বলে খাতাটি আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন পড়ো, তোমার বান্ধবী কী লিখলো। খাতার দিকে তাকিয়ে পড়া শুরু করলাম, প্রথম লাইন লেখা Bangladesh is a land of rivers. তারপরের লাইনে একই কথা লেখা, তারপরের পরের লাইনটাতে একই - পুরাটা খাতায় ওই একটা লাইন-ই লেখা।

একটি ভূতের গল্প

মো. মহসীন
গ্রুপ জিএম, অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড ফিন্যান্স
ব্যাবিলন গ্রুপ

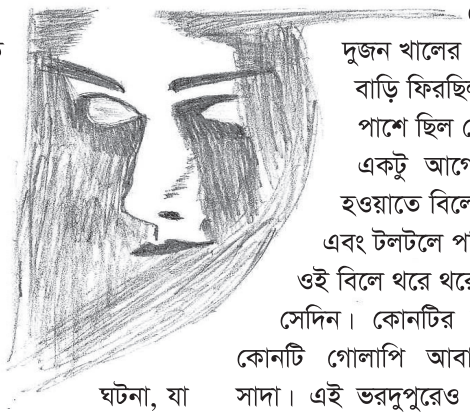

আমি জানি পাঠক আপনারা অনেকে হয়ত ভূতে বিশ্বাস করেন না, আমি নিজেও করি না। কিন্তু মাঝে মাঝে আমাদের চারিপাশে এমনসব রহস্যময় ঘটনা ঘটে, তখন সেগুলোর উত্তর আমাদের কাছে থাকে না। তেমনি একটি ঘটনা, যা শুনে আপনি নিজেই আপনার বিশ্বাস নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে যাবেন।

তখন আমি (সাকিব) ইন্টারমিডিয়েটে পুরোনো ঢাকার একটি কলেজে পড়ি। আমার এলাকার বন্ধু সেলিমও একই কলেজে পড়তো। সেদিন কলেজ ছুটির পর বাসে চড়ে আমরা দুজন একসাথে বাড়ি ফিরছিলাম। তখন পড়ন্ত দুপুর। বাসস্ট্যান্ডে নামার পর পেটে প্রচণ্ড খিদে অনুভব করলাম, সকালে নাস্তা না খেয়ে কলেজে যাওয়ার কারণে, যা ছিল আমার প্রতিদিনের নৈমিত্তিক ঘটনা। তার একটা কারণও আছে, সেটা পরে বলব। যাইহোক বাস স্ট্যান্ডের পাশ ঘেঁষে একটা সরকারি খাল শীতলক্ষ্যা নদীর সাথে গিয়ে মিশেছে, সেই খালের পাশ দিয়ে রাস্তা ধরে আমাদের গ্রামে যেতে হয়। সেদিন দুজন খালের পাশের রাস্তা ধরে বাড়ি ফিরছিলাম। রাস্তার ডান পাশে ছিল ছোট একটা বিল। একটু আগে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হওয়াতে বিলের পানি বেশ স্বচ্ছ এবং টলটলে পরিষ্কার দেখাচ্ছিল। ওই বিলে থরে থরে শাপলা ফুটেছিল সেদিন। কোনটির রং হালকা লাল, কোনটি গোলাপি আবার কোনটি বেশ সাদা। এই ভরদুপুরেও বিল থেকে আসা হালকা একটা ঠান্ডা বাতাসের মৃদুপ্রবাহের মধ্যে হাঁটতে বেশ ভালো লাগছিল, যার ফলে পেটের খিদের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।

বাড়ির কাছাকাছি আসতেই, বিলের দিকে মানুষের হট্টগোল শুনতে পেলাম। প্রথমে ভেবেছি কোন বাচ্চা হয়তো পানিতে ডুবে গেছে। প্রতি বছর এই রহস্যময় বিলে, হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালার বাঁশির সুরের মোহের মত, বাচ্চারা কী এক অজানা টানে শাপলাফুল তোলার নেশায় ছুটে যায়, তারপর ডুবে মারা যায়। বর্ষাকাল আসলেই সবার মধ্যে একটা আতঙ্ক বিরাজ করতো এবং প্রতিবছর একটা না একটা অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা ঘটত-ই। সবাই বলতো মানুষখেকো বিল। যাইহোক আমরা

দুজন দৌড়ে গিয়ে দেখি, বিলের মাঝখানে যেখানটায় একটা উঁচু জায়গা আছে, সেখানে একটা মেয়ের মত কেউ দাঁড়িয়ে এবং তার কাছাকাছি নৌকাতে দুজন সেই মেয়েটার সাথে উচ্চৈঃস্বরে কী যেন কথাবার্তা বলছে। দূর থেকে ঠিকমতো ঘটনাটি বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

বিলের পাড়ে বন্ধু শিপনের থেকে জানতে পারলাম, সেলিমের ছোট বোন শায়লাকে (তখন ক্লাস নাইনে পড়তো) ভূতে আছড় করেছে। সে এই ভরদুপুরে, এক দৌড়ে বিলে নেমে, গলা পর্যন্ত পানি পার হয়ে মাঝের ওই উঁচু জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অথচ শায়লা সাঁতারই জানেনা। বিলে কোথাও কোথাও কিছু গভীর খাদ ছিলো, সেখানে অনায়াসে শায়লা ডুবে যেতে পারতো। শিপন আরো জানালো, আমাদেরই দু-বন্ধু শহিদ আর হাবিব শায়লাকে উদ্ধার করতে নৌকা নিয়ে গেছে।

সেলিম শায়লার অবস্থা শুনে খুব ঘাবড়ে গেল, আমাকে বলল সাকিব তুই কিছু একটা কর। এরই মধ্যে সেলিমের মা-বাবার সাথে দেখা। আমাকে দেখে তার মা হাউমাউ করে কেঁদে দিল। বলল, বাবা সাকিব আমার মেয়েটাকে বাঁচাও, তা না হলে ভূত ওকে পানিতে ডুবিয়ে মেরে ফেলবে।

হাবিব এবং শহিদের মতো আমারও এলাকায় একটা সুনাম ছিল, সমাজের বিভিন্ন বিপদে-আপদে ঝাঁপিয়ে পড়ার। আমি পাড়ে রাখা একটি কোষা নৌকা নিয়ে বিলের ওই উঁচু ঢিবির দিকে রওয়ানা হলাম। বিলের কিছুটা ভেতরে যাওয়ার পর চারিপাশে প্রচুর লাল রংয়ের শাপলা ফুল দেখতে পেলাম, যা সচরাচর দেখা যায় না। আমি এত বছরে, এই বিলে কখনও এই রংয়ের শাপলা ফুল দেখিনি। তবে এই ধরনের বিরল শাপলা ফুলের গল্প মুরুব্বিদের মুখে শুনেছি। অনেকের ধারণা এই লাল শাপলা ফুলগুলো নাকি সাপ আর জিন পাহারা দিয়ে রাখে, আরও কত কী! আমি শাপলা ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে বিমোহিত হয়ে কী একটা ঘোরের মধ্যে চলে গেলাম। হঠাৎ সম্বিত ফিরে এল, তাকিয়ে দেখি আমি ঘোরের মধ্যে বিলের অন্যপ্রান্তে হিন্দুদের নির্জন শ্মশানঘাটের দিকে চলে গিয়েছি। বুঝতে পারছিলাম না, এই ভুল কী করে হল? হঠাৎ প্রচণ্ড একটা বাতাসে আমার ছোট কোষা নৌকাটি উল্টে যাবার উপক্রম হল, কোনভাবে নিজেকে সামলে নিলাম। আমি এই ভরদুপুরে এরকম বাতাস দেখে রীতিমতো ঘাবড়ে গেলাম। বুঝলাম কিছু একটা গন্ডগোল আছে। তাহলে এটা কি ভূতের কাণ্ড। শুনেছিলাম ভয় পেলে ভূতেরা নাকি আরো চেপে ধরে, তাই সাহস সঞ্চয় করে, তাড়াতাড়ি নৌকা ঘুরিয়ে, উঁচু ঢিবির দিকে রওয়ানা দিলাম।

ঢিবির কাছে পৌঁছে দেখি শহিদ এবং হাবিব শায়লাকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু কিছুতেই সে শুনছে না। শায়লার অগ্নিমূর্তি দেখে আমিতো রীতিমতো অবাক। তার নীলচোখগুলো রক্তজবা ফুলের মত লাল-টকটকে হয়ে আছে। এখানে বলে রাখা ভালো, সেলিমদের ফ্যামিলির বেশিরভাগ সদস্যদের চোখ নীল এবং গায়ের রং ধবধবে ফর্সা। মুরুব্বিদের মুখে শুনেছি, তাদের পূর্বপুরুষ পারস্য তথা

আজকের ইরানের খোরাসান প্রদেশ থেকে আমাদের এলাকায় ধর্মপ্রচার করতে এসে এখানেই বসতি স্থাপন করেছে। তাদের কথাবার্তা, চালচলনে একধরনের আভিজাত্য ছিল এবং সবাই শিক্ষিত, সেই ছোটবেলা থেকেই দেখছি। সেলিমদের সমাজকে এলাকায় বোম্বাইয়া বাড়ি বলা হয়। এই নামকরণের পেছনের ইতিহাসটা আমার জানা নেই। যাইহোক শায়লার দিকে তাকিয়ে দেখি তার চুলগুলো এলোমেলো, একদিকে ঘাড় কাত করে দাঁড়িয়ে আছে আর মুখে অদ্ভুত গোঙানির শব্দ, যা শুনে যে কেউ ভয় পেয়ে যাবে। চিৎকার করে বলছে, খবরদার কেউ কাছে আসবি না, সবাইকে পানিতে ডুবিয়ে মারবো। যে কর্কশ গলা দিয়ে সে ক্রমাগত হমকি দিয়ে যাচ্ছে সেটা যে শায়লার নয়, তা পরিষ্কার। কিন্ত এটা যে ভূত-প্রেতের কাজ সেটাও বিশ্বাস করতে পারছি না। কিন্তু যে ঘটনা আমার সামনে ঘটছে সেটারও ব্যাখ্যা আমার জানা নেই।

আমি ধৈর্য্য ধরতে না পেরে, আস্তে করে নৌকা থেকে পানিতে নেমে, এক ডুব দিয়ে ঢিবিটির পেছনে পৌঁছে গেলাম, তারপর চুপিসারে হঠাৎ সামনে এসে শায়লার দুহাত শক্ত করে চেপে ধরলাম। কিন্তু শরীরে প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে শায়লা আমাকে রীতিমতো ছুড়ে ফেলে দিল। আমিও দমবার পাত্র নই, শায়লার বীভৎস গোঙানি এবং রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে আমি ওর কাছে গিয়ে আবারো শক্ত করে ওর হাত ধরে ফেললাম। প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে শায়লা এবার আমাকে পানিতে ছুড়ে ফেলে দিল। আমার অবস্থা বেগতিক দেখে, হাবিব এবং শহিদ তৎক্ষণাৎ নৌকা থেকে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতরে ঢিবির উপরে উঠেই দুজন মিলে শায়লাকে জাপটে ধরলো। এর মধ্যে আমিও এসে ওকে শক্ত করে ধরলাম। প্রচণ্ড ধস্তাধস্তির মধ্যে শায়লা হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেলো। এতটুকু মেয়ের গায়ে এত শক্তি কোত্থেকে আসলো, যেখানে আমরা তিনজন শায়লার শক্তির সাথে পেরে উঠছি না। এই রহস্য শুধু মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিলো। তাহলে ভূত বা শয়তান বলে কিছু কি আছে! যে শায়লার উপরে ভর করে তার ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ করে তাকে দিয়ে এতোসব করাচ্ছে! ভূত-প্রেত না থাকলে, কে এতোসব রহস্যময় ঘটনা ঘটাচ্ছে? যাই হোক সবাই মিলে ওকে নৌকায় তুলে পাড়ে নিয়ে গেলাম।

পাড়ে পৌঁছানোর পরপরই, শায়লা গোঙানি শুরু করল। তারপর হঠাৎ এক লাফ দিয়ে উঠেই ভোঁ-দৌড়। আমরাতো কিংকর্তব্যবিমূঢ়, ওর মায়ের চিৎকারে সম্বিত ফিরে পেলাম। পরক্ষণে আমরাও শায়লার পিছু পিছু ছুটলাম।

শীতলক্ষ্যা নদীর পাড়ে সরকারি একটা কৃষি সম্প্রসারণ অফিস ছিলো। গাছগাছালিতে ভরা বেশ নির্জন-ছিমছাম ছিল জায়গাটা। সেখানে বেশ বড় বড় কয়েকটা সেগুন গাছ ছিলো। শায়লা এক দৌড়ে সেই অফিসে ঢুকে কাঠবিড়ালীর মত বেয়ে সেগুন গাছের মাঝামাঝি জায়গায় উঠে গেল। আমরা সবাইতো রীতিমতো বিস্মিত, এটা সত্যি দেখছি নাকি স্বপ্ন! আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। কোন মানুষের দ্বারা এটা ছিল পুরোপুরি অসম্ভব একটা ব্যাপার।

তারপর গাছে বসেই আবার প্রচণ্ড গোঙানি

শুরু করল। আমাদের ভয় হলো এই ভেবে যে, যদি শায়লা গাছে অজ্ঞান হয়ে নিচে মাটিতে পড়ে যায়, তাহলে তো মহাবিপদ। এরমধ্যে হাবিব কোত্থেকে কঞ্চিসহ লম্বা একটা শুকনা বাঁশ জোগাড় করে নিয়ে এসেছে।

আমরা বাঁশটা সেগুনগাছের সাথে হেলান দিয়ে, এক এক করে তিনজন বেয়ে উপরে উঠতেই দেখি শায়লার অগ্নিমূর্তি। হাবিব খপ করে ওর হাত ধরে ফেলার সাথে সাথে শায়লা আবার অজ্ঞান হয়ে গেলো। কোনভাবে গাছের তিন ডালের কোনার সাথে ওকে আটকে, অনেক কষ্টে দড়ি দিয়ে বেঁধে আস্তে আস্তে নিচে নামানো হলো। তারপর ধরাধরি করে রিকশা নিয়ে ওদের অন্দর বাড়ির প্রবেশ পথেই বৈঠকখানায় শুয়ে দেয়ার পর জানতে পারলাম, পূর্বপাড়ার কালু কবিরাজকে এরমধ্যে খবর দেয়া হয়েছে, শায়লার ভূত তাড়ানোর জন্য।

অল্পক্ষণের ভেতরে সেলিমের সাথে কালু কবিরাজ এসে হাজির। তার দশ আঙ্গুলে বিভিন্ন রংয়ের দশটি পাথরের আংটি পড়া। এসেই চারিদিকে ঝাড়-ফুঁক শুরু করল, তারপর হাতে রাখা খেজুর গাছের পাতার ঝাটা দিয়ে এদিক সেদিক এবং শায়লার শরীরে বাড়ি মারছে আর বলছে, ওরে খতরনাক ভূতে ধরছে, এই ভূত ছাড়ানোটা খুব বিপদজনক কাজ হইবো। সাহসী কয়েকজন ছাড়া এই ঘর ছাইড়া সবাই চইলা যান। একটু পর দেখি আমি হাবিব, শহিদ, শিপন, গ্রামের আরেক মুরুব্বি মনির কাকা এবং কবিরাজের এক সাগরেদ ছাড়া ঘরে আর কেউ নেই। শায়লার ভাই সেলিমসহ সবাই ভয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেছে। ভূত তাড়ানোর মহা-আয়োজন দেখে আমিতো রীতিমতো বিস্মিত। কবিরাজের সাগরেদ ধূপের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে ধোঁয়া দিয়ে পুরো ঘরটা অন্ধকারের মত করে ফেলল, তারপর একটা কুলা বের করে তার মধ্যে ছোলা বুট ঢাললো। আর আশেপাশে গরুর মাথার হাড়গোড়, লজ্জাবতী গাছ, ফণীমনসার পাতা, আরো আজগুবি সব জিনিস বের করে কবিরাজের সামনে সাজিয়ে রাখল। সে এক মহা হুলস্থুল কাণ্ড।

এরমধ্যেই নতুন একটা বিপদ দেখা দিলো বন্ধু শিপনকে নিয়ে। সে আমার মতই একটু প্রোগ্রেসিভ মাইন্ডের, ভূত-প্রেতে তেমন বিশ্বাসই করে না। কালু কবিরাজের ভূত তাড়ানোর আয়োজন দেখে বিরক্ত হয়ে শিপন বলল, দেখ সাকিব, ভূত-তূত বলে কিছু নেই, সব ভাওতাবাজি। শায়লাকে বরং চল ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই। এ কথা বলতে না বলতেই, মুহূর্তের মধ্যে শায়লা অজ্ঞান অবস্থা থেকে লাফ দিয়ে উঠে ধপাস করে প্রচণ্ড শক্তিতে শিপনের গালে চড় মেরে বসলো। সাথে সাথে শিপন অজ্ঞান হয়ে গেলো। ঘটনার আকস্মিকতায় আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। শিপনের চড় খাওয়ার ঘটনার ব্যাখ্যা আজও আমার কাছে রহস্যই রয়ে গেল।

তারপর শায়লা বাঘের মত হুংকার দিয়ে ঘুরে ঘুরে সবার দিকে তাকাচ্ছে আর বলছে, কেউ বাঁচতে পারবিনা। হঠাৎ কান্নাজড়িত কণ্ঠে চিৎকার করে বলল, আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও, আমাকে মেরে ফেলল,

আমাকে মেরে ফেলল। ওরে বাবারে আমার হাত গেল, আমার হাত গেল। তাকিয়ে দেখি তার দুহাত জুড়ে বেতের মত কিছু দিয়ে মারার লালচে দাগ দেখা যাচ্ছে। এবার চিৎকার করে বলছে আমার ভ্রু গেল, আমার ভ্রু গেল, তাকিয়ে দেখি তার দু-ভ্রুর একটা চুলও অবশিষ্ট নেই। তারপর চুলগুলো ধরে চিৎকার করে বলছে আমার সব চুল তুলে ফেলতেছে, আমার চুল তুলে ফেলতেছে। বিশ্বাস করুন পাঠক তার গোছা গোছা চুল মাথা থেকে ঝরে ঝরে নিচে পড়ছে। আমিতো রীতিমতো বিস্মিত এবং হতভম্ব এই ভেবে যে এটা কী করে সম্ভব। মনে হল অদৃশ্য কেউ তার চুলগুলো টেনে টেনে তুলে নিচে ফেলছে যাকে আমরা দেখতে পারছি না। সেই ঘটনার রহস্যও আমার কাছে আজও রহস্যই থেকে গেলো। তাহলে ভূতের ঘটনা কি সত্যি? ভূত বলে কারও কি কোনও অস্তিত্ব আছে!

যেহেতু আমি সামনে থেকেও কিছু করতে পারছি না, তাই অজান্তেই কালু কবিরাজের ভূত-তাড়ানোর কর্মকাণ্ডের উপর নির্ভরশীল হয়ে গেলাম। অসহায়ের মত কালু কবিরাজকে অনুরোধ করলাম, শায়লাকে এই ভৌতিক অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচাতে।

কালু কবিরাজ তৎক্ষনাৎ কুলার মধ্যে রাখা ডালগুলো জোরে জোরে নাড়া শুরু করল আর বিভিন্ন তন্ত্র-মন্ত্র পড়তে লাগল, যাকে কবিরাজের ভাষায়, কুফরি কালাম বলা হয়। এরমধ্যে ধূপের ধোঁয়াগুলো ফুঁ দিয়ে শায়লার দিকে দিচ্ছে আর কী একটা পড়াপানি শায়লার শরীরে কিছুক্ষণ পরপর ছিটাচ্ছে। মনে হল কালু কবিরাজের মন্ত্র-ফন্ত্র কাজ করেছে, শায়লা আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে মেঝেতে ঢলে পড়ল।

এরমধ্যে শিপনের জ্ঞান ফিরল, ওর পুরো শরীর তখনও ভয়ে থরথর করে কাঁপছিল আর ঘোরের মধ্যে আবোল-তাবোল বকছিল। তাকিয়ে দেখি ওর ফর্সা গালে হাতের পাঁচ আঙ্গুলের বড় বড় লালচে দাগ তখনও বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। আপাতদৃষ্টিতে যদিও সবাই দেখেছে শায়লা চড়টা মেরেছে, কিন্তু শিপনের গালের ওই বড় বড় আঙ্গুলের ছাপটা দেখে, যে কেউ অনায়াসে বুঝবে যে এটা শায়লার হাতের ছোট ছোট আঙ্গুলের ছাপ নয়। তাহলে শায়লার মধ্যে সত্যিই কি কোন ভূত ভর করেছে, যে এই চড়টা মেরেছে!

এতসব উদ্ভট জিনিস নিয়ে যখন ভাবছি, হঠাৎ দেখি শায়লা অজ্ঞান অবস্থায় কাটা শিং মাছের মত লাফাচ্ছে। কালু কবিরাজ তৎক্ষণাৎ চিৎকার করে বলল, তাড়াতাড়ি দরজা-জানালা সব বন্ধ কইরা, পর্দাগুলো টাইনা পুরো ঘরটারে আরো অন্ধকার করন লাগবো। কেউ ডরাইয়েন না, আমি আরেকটা ভূত এইঘরে আনুম। সেই ভূত শায়লার ভূতরে মাইরা তাড়াইবো। তা না হইলে ওই শয়তান ভূতটা ওরে মাইরা ফালাইবো। সবাই চোখ বন্ধ কইরা দোয়া-দরুদ পড়বেন। উনি না বলা পর্যন্ত কেউ যদি চোখ খুলেন, আর তার যদি কোন বিপদ হয়, তাহলে তাকে কোন দোষ দেয়া যাবে না। সবাইতো ভয়ে অস্থির। এদিকে শায়লার গোঙানির শব্দ, কুলার ডাল নাড়ানোর শব্দ, কালু কবিরাজের দ্রুতগতির

কুফরি কালামের তন্ত্র-মন্ত্রের চিৎকারে এক বীভৎস ভয়ের পরিবেশের সৃষ্টি হল। হঠাৎ ঘরের মধ্যে ভীষণ ধুপধাপ লাফানোর আওয়াজ শুনতে পেলাম, আর কেমন একটা সুগন্ধিতে ঘরটা ভরে গেলো।

আমি কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে যেইনা চোখটা খুলেছি, দেখি ঠিক আমার চোখ বরাবর দুটি রক্তলাল চোখ আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি কয়েক সেকেন্ড সেই চোখের দিকে তাকিয়ে সিওর হওয়ার চেষ্টা করলাম, আসলেই কেউ কি না! একটু হাতটা সামনের দিকে নাড়াতেই টের পেলাম বানরের মত খুব নরম নরম পশম। আমার চোখে মুহূর্তের মধ্যে জোরে একটা ফুঁ দিয়ে কে যেন ধমকের সুরে আমাকে চোখ বন্ধ করতে বলল। সেই ফুঁতে সুন্দর আতরের মতো একটা গন্ধ টের পেলাম। আমার সন্দেহ ছিল কালু কবিরাজ নিজেই এসব করছে কি না! একটু চোখ ঘুরাতেই আবছা আবছা অন্ধকারে দেখলাম কালু কবিরাজ কুলার ডালগুলো বারবার নাড়াচ্ছে আর জোরে জোরে তন্ত্র-মন্ত্র জপছে। আমি কিছুটা ভয়ে আবার চোখ বন্ধ করলাম। মুহূর্তের মধ্যে পুরো বাড়িটি যেন কেঁপে উঠল, মনে হচ্ছে বৈশাখের ঝড়ে, টিনের চাল যেন আমাদের উপর ভেঙে পড়ছে। সে এক মহা প্রলয়কাণ্ড।

কিছুক্ষণ পর দেখি সব ঠান্ডা, চারিদিক স্তব্ধ। প্রচণ্ড ঝড়ের পর যেমন প্রকৃতি চুপ হয়ে যায় ঠিক তেমনি। কালু কবিরাজ সবাইকে চোখ খুলতে বললো এবং দরজা, জানালা, পর্দা সব খুলে দিতে বললো।

সারাদিনে আজ যেসব ভৌতিক কাণ্ডকারখানা একটার পর একটা ঘটেছিল, মনে মনে তার সবকিছুর একটা লজিক খোঁজার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু কিছুতেই হিসেব মেলাতে পারছিলাম না।

এরমধ্যে কালু কবিরাজ জানাল বিপদ কেটে গেছে, এখন তার মা-বাবাকে খবর দেন। শহিদ ভিতর বাড়ি গিয়ে শায়লার বাবা-মা এবং সেলিমকে সঙ্গে নিয়ে বৈঠকখানায় ঢুকলো। সবাইকে বেশ খানিকটা ভীতসন্ত্রস্ত দেখাচ্ছে। সেলিমের মা আঁচল দিয়ে তার চোখটা মুছলো, বুঝলাম অনেক কেঁদেছে। আসলে মা তো মা-ই। মায়ের মনে সন্তানের জন্য যে কী মায়া, কত দরদ সেটা একজন মা ছাড়া পৃথিবীর কেউ বুঝবেনা। মাত্র দশবছর বয়সে আমি মাকে হারিয়ে বুঝেছি কত যন্ত্রণা এই বুকে, প্রতিটা ক্ষণে, প্রতিটা মুহূর্তে, আজও মায়ের অভাবটা বুঝতে পারি।

এরমধ্যে কালু কবিরাজ শায়লার মা এর হাতে দুটো তাবিজ দিয়ে বলল, জ্ঞান ফেরার সাথে সাথে একটা ওর গলায় বা হাতে বেঁধে দিতে, আর আরেকটা বাড়ির পিছনে গর্ত খুঁড়ে অমাবস্যার রাতের দ্বিপ্রহরে মাটির নিচে চাপা দিয়ে রাখতে। তাহলে পুরো বাড়িটি বন্ধ হবে, শয়তান আর কখনও এই বাড়িতে ঢুকতে পারবে না।

কিছুক্ষণের ভেতর শায়লার জ্ঞান ফিরলো এবং বলল তার সারা শরীর ব্যথা করছে। তারপর সব ঘটনা শুনে সে তো রীতিমতো অবাক।

এরপরই শায়লার ঘটনার নতুন টুইস্ট শুরু হলো যা শুনে পাঠক আপনারাও চরম বিস্মিত হবেন।

শায়লার আম্মা শায়লাকে পানি খাওয়াতে খাওয়াতে জিজ্ঞেস করলো, তুই না ছাদে কাপড় আনতে গেলি গোসল করবি বলে, তো এই ভরদুপুরে বিলের দিকে কী করে গেলি?

শায়লা আড়চোখে একবার আমার দিকে তাকাল। তারপর বলল, আমি যখন ছাদে গেলাম, নিচে তাকিয়ে দেখি, সাকিব ভাই আমাদের বাসার সামনে দিয়ে যাচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম এই দুপুর বেলায় কোথায় যাচ্ছেন। বললো -বিলের দিকে যাচ্ছি। সেখানে বিভিন্ন জাতের রক্তজবার মত লাল রংয়ের শাপলা ফুটেছে, সেটা তুলতে যাচ্ছি। দুপুর বেলায় এই ফুল তুলতে হয়, সূর্য পড়ে গেলে এই লাল-শাপলাগুলি চেনা যায় না।

বিলের দিকে তাকিয়ে দেখি, পুরো বিল জুড়ে লাল-লাল শাপলা ফুল ফুটে আছে। রৌদ্রের আলোয় ফুলগুলো ঝিকিমিকি করে রংধনুর মতো চারিদিকে কিরণ ছড়াচ্ছে। কী যে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য ছিলো, কেউ না দেখলে সে মুহূর্ত বোঝানো যাবে না। আমি এতদিন ধরে ছাদে যাই, কিন্তু আজকের মত এত সুন্দর দৃশ্য বিলের মধ্যে কখনও দেখিনি। শাপলাগুলোর অপরূপ সৌন্দর্য্যে আমি বিমোহিত হয়ে গিয়েছিলাম।

আমি তখন বললাম, সাকিব ভাই আমিও যাবো আপনার সঙ্গে। আমিও ওই লাল শাপলা ফুল তুলতে চাই।
সাকিব ভাই তখন বললো, তাহলে তাড়াতাড়ি চলো, সূর্য হেলে গেলে ওই লাল রংয়ের শাপলাগুলি আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তখন আমি দ্রুত ছাদ থেকে নেমে উনার সাথে বিলে গিয়েছি। তারপর আর কিছু খেয়াল নেই।

শায়লার কথাশুনে আমিতো ভীষণ অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম। তৎক্ষনাৎ বললাম, কি বলছো শায়লা এসব। তোমার কোথাও হয়তো ভুল হচ্ছে। আমিতো কলেজ থেকে ফিরে দেখলাম, তুমি বিলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছো। আমি কখন তোমাকে বিলে নিয়ে গিয়েছি? তুমি তোমার ভাই সেলিমকে জিজ্ঞেস করো আমার কথা সত্যি কিনা?

তখন সেলিম বললো, এটা কী করে সম্ভব! আমি আর সাকিবতো একসঙ্গে কলেজ থেকে ফিরলাম। তুই এইসব উল্টাপাল্টা কী বলতেছোস। তোর কি মাথা ঠিক আছে।

শায়লা তখন বললো, বিশ্বাস কর ভাইয়া, আমি সাকিব ভাইয়ের সঙ্গেই বিলে গিয়েছি।

ঠিক তখন কালু কবিরাজ বলল, শায়লা মা ঠিকই বলছে, ও সাকিবের সঙ্গেই বিলে গেছিলো।

কালু কবিরাজের কথা শুনে আমিতো ভীষণ রেগে গেলাম। বললাম আপনি সবকিছু না জেনে উল্টাপাল্টা কথা বলছেন কেন? যেখানে শায়লার ভাই সেলিম পর্যন্ত বলছে

আমরা একসাথে কলেজ থেকে ফিরেছি। তখন কালু কবিরাজ বলল, রাগ কইরো না বাবা। তোমার কথাও ঠিক আছে, আবার শায়লাও সত্যি কথা বলছে। আসলে হইছে কী, ভরদুপুরে ভূতেরা বিভিন্ন লোকজনের রূপ ধইরা আইসা মানুষরে বিমোহিত কইরা নির্জন জায়গায় নিয়া গিয়া ক্ষতি করে। ওই ভূতটা তোমার রূপ ধইরা আইছিলো।

আচ্ছা শায়লা মা, তুমি কি শাপলা ফুল পছন্দ করো?
শায়লা উত্তর দিল, জি চাচা ভীষণ-ভীষণ পছন্দ করি।

তুমি মনে হয়, বাসার ছাদ থেইকা প্রায়ই ওই শাপলা ফুলগুলোর দিকে তাকাইয়া থাকো, আর চিন্তা করো যদি কাছে গিয়া ওই শাপলাগুলা একটু ছুঁইতে পারতাম, তুলতে পারতাম ।

জি চাচা, মনে হতো আমি যদি সাঁতার জানতাম তাহলে ওই বিলে নেমে সাঁতরে শাপলাগুলোর কাছে যেতাম, আর কয়েকটা শাপলা তুলে এনে আমার টেবিলের ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখতাম।

দেখো শয়তান মানুষের মনে, ইন্দ্রিয়তেও ঢুইকা মানুষের ইচ্ছাশক্তিগুলা, মনের আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলারে জানতে পারে। রক্তলাল শাপলাফুল শয়তানদের কাছে অমূল্য সম্পদ, তারা যেকোন প্রকারে এগুলো আগলে রাখে। তুমি যে প্রতিদিন ছাদে উইঠা বিলের দিকে তাকাইয়া থাকতা, আর মনে মনে ভাবতা শাপলা ফুলগুলি তুলবা, তোমার মনের সে ইচ্ছা শয়তানরা জাইনা যায়। তোমার মনের এই গোপন ইচ্ছে তাদের কাছে ক্ষতিকর মনে হইছে। আর মনে রাখবা, শয়তানরা সাধারণত ভর দুপুরবেলা, সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে আর রাত দুইটার পর বাইর হয়। ভর দুপুরে শয়তান যখন তোমারে একলা ছাদে দেখছে তখনই তোমার উপর আছড় করছে, তোমার ক্ষতি করার চেষ্টা করছে।

অন্যদিকে তোমার অবচেতন মনে হয়তো সাকিব একটা খুব ভালো জায়গা দখল কইরা আছে, যারে তুমি বিশ্বাস করো, ভালো জানো। তাই শয়তান জানে সে যদি সাকিবের রূপ ধইরা আসে তাইলে তোমারে বাইর কইরা বিলে নিয়া যাওয়া সহজ হইবো, তারপর তোমার ক্ষতি করতে পারবো। পৃথিবীটা বড় রহস্যময় মা।

কালু কবিরাজের কথা শুনে, শায়লার ফর্সা মুখটি লজ্জায় লাল হয়ে গিয়েছিলো। তারপর আড়চোখে আমার দিকে একপলক তাকিয়ে লজ্জায় তার চোখটা নামিয়ে ফেললো।

আমি আরেকটা নতুন অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেলাম। শায়লা যে আমাকে পছন্দ করে, সেটা আজ প্রথম জানলাম। ও বরাবর দেখেছি, খুব রিজার্ভড প্রকৃতির মেয়ে। সেলিমদের বাসায়ও কখনও তেমন একটা সামনে আসতো না। রাস্তায় দুএকবার দেখা হলে শুধু জিজ্ঞেস করতো, কেমন আছি।

ভাগ্যকে ছোট একটা ধন্যবাদ দিলাম এই কারণে যে, আজ যদি কলেজে আসার পথে সেলিমের সাথে দেখা না হতো, তাহলে

সবার মনের মধ্যে একটা কিন্তু কাজ করতো। যে বদনাম হয়তো আমাকে সারাজীবন বয়ে বেড়াতে হতো।

অস্বস্তি কাটাতে, একটু আসছি বলে বাইরে বেরিয়ে দেখি এর মধ্যে কখন যে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেছে, টেরই পাইনি। পেটে প্রচণ্ড খিদেটা হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। আজ সকাল থেকে এমনিতে না খাওয়া। যেহেতু আমার ঘরে সৎ মা, তাই বাড়িতে এত দেরিতে গিয়ে খেতে বসলে, দেখা যাবে ভাতের পরিবর্তে বকাঝকা অপেক্ষা করে আছে। চিৎকার চেঁচামেচি এখন আর একদম ভাল লাগে না। তাছাড়া হিসেব করে কলেজে আসা-যাওয়ার জন্য শুধু ভাড়াটা দেয়া হতো, যার কারণে আমার কাছে বাড়তি টাকাও ছিল না যে দোকান থেকে কিছু কিনে খাবো। হঠাৎ মার কথা ভীষণ মনে পড়ল। অজান্তে চোখের কোণে পানি এসে গেলো।

আস্তে আস্তে নদীর দিকে হাঁটা ধরলাম, তারপর কাশবনের পাশে একটা ফাঁকা জায়গা দেখে বসলাম। আকাশটার দিকে তাকিয়ে দেখি, বর্ষাকালের আকাশটা শরৎকালের মতই পরিষ্কার এবং বেশ স্বচ্ছ। ওখানে মাকে কিছুক্ষণ খুঁজলাম। হঠাৎ ভীষণ অভিমান হল তার উপর, আমাকে এভাবে একা ফেলে পরপারে চলে যাওয়ার জন্য। ভীষণ কান্না পেল। এ কষ্ট কাউকে বোঝানোর মতো না। সেই কষ্টটা একান্তই শুধু আমার। দূরে পানকৌড়িগুলোও নদীতে নিজের মতো করে ডুব দিয়ে মাছ ধরে ধরে খাচ্ছে, আর প্রকৃতির সেরা জীব হয়েও আমি আজ সারাদিন না খেয়ে আছি।

এখনও আকাশের দিকে তাকিয়ে আমার মাকে সেখানে খুঁজি, আর তার সাথে একা একা অভিমান করি। আজ এতটা বছর পরেও সেই অল্পবয়সে মা-হারানোর কষ্টের স্মৃতি মন থেকে কিছুতেই মুছতে পারছি না।

পৃথিবীটা সত্যি বড় রহস্যময়। এই রক্তজবা লাল শাপলাফুলের ভূতের গল্পের মতো কিছু কিছু রহস্যময় ঘটনা রহস্যময়ই থেকে যায়, আমরা সে রহস্য ভেদ করতে পারি না। সেখানেই আমাদের সীমাবদ্ধতা।

শুক্রবারের গল্প

আরিফ হোসেন
অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, এইচআর অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স
ব্যাবিলন গ্রুপ

গ্রীষ্মের তপ্ত-নির্জন দুপুর, সময় দেড়টা। এ সময়টাতে খুব বেশি প্রয়োজন না হলে সাধারণত কেউ ঘরের বাইরে বের হয় না। শুভ তার রুমে বিছানায় শুয়ে আছে। দ্বিতীয় তলার চিলেকোঠার মতো ছোট্ট একটি রুমে থাকে শুভ। একজন মানুষ হাঁটার মতো সরু একটি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে হয়। বাড়িটির গেটের বাইরে থেকে রুমটিকে দেখাই যায় না, গ্যাংস্টার কিংবা আন্ডারওয়ার্ল্ডের ডনের গোপন আস্তানার মতো রুম। রুমে লোহার দু'পাট বিশিষ্ট দক্ষিণমুখী একটি দরজা কিন্তু কোনো জানালা নেই, উপরে টিনের চাল। প্রচণ্ড গরম থেকে স্বস্তি দিতে মাথার উপরের ফ্যানটি ঘুরে ঘুরে হয়রান হচ্ছে। দুপুর দুইটায় বসুন্ধরার তিনশ ফিট এলাকায় তার যাওয়ার কথা। মোটরবাইক চালনায় শুভর আজ হাতেখড়ি হবে। সেই স্কুল জীবন থেকেই দ্বিচক্রযানের প্রতি একটা অদ্ভুত আসক্তি রয়েছে শুভর! স্কুলে পড়াকালীন সময়ে পরিস্থিতি যেমনই হোক– তপ্ত রোদ কিংবা মুষলধারে বৃষ্টি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অকারণে মাইলের পর মাইল সাইকেল চালাতো বন্ধু মাসুদের সাথে। এমনকি ১০০ ডিগ্রির উপরে জ্বর নিয়েও সাইকেল চালিয়েছে ওরা। অনেকগুলো বছর জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। সময় অনেক বদলেছে! এবার মোটরচালিত দ্বিচক্রযান চালানোর পালা।

শুভর ভীষণ মাথা ব্যথা করছে। এ মুহূর্তে কালোজিরা, মধু, লেবু ও চা মিশ্রিত এক কাপ গরম পানি হলে খুব ভালো হতো। চা বানানোর জন্য বিছানা থেকে ওঠে শুভ। হঠাৎ রুমের ভিতরটা কেমন অন্ধকার হয়ে আসে। দরজার সামনে দাঁড়ায় শুভ। কোত্থেকে যেন বিশাল কালো মেঘ এসে হঠাৎ পুরো আকাশটাকে ঢেকে দিয়েছে। রাগী সূর্যটার তপ্ত কিরণে পুড়তে থাকা সমস্ত গাছপালা, রাস্তা, ঘরবাড়িগুলো হঠাৎ যেন স্বস্তি ফিরে পেল। প্রকৃতির হঠাৎ এ রূপ বদলের ফলে কিছুক্ষণ থমকে যায় চারপাশ। এরপর শুরু হয় ঘূর্ণিবাতাস, রাস্তার সব ধুলো উড়ে আছড়ে পড়তে থাকে এখানে-সেখানে। শুভ তার রুমের দরজা বন্ধ করতে বাধ্য হয়। কিছুক্ষণ পরই শুনতে পায় টিনের চালে বৃষ্টি পড়ার শব্দ। মাথার উপর ঘুরতে

থাকা ফ্যানটিকে এবার বিশ্রাম দেয় শুভ। বাইরে তখন তুমুল বৃষ্টি। মোবাইলের রিংটোন বেজে ওঠে। এর মানে বন্ধু মাসুদ কল করেছে। এ মুহূর্তে কথা বলতে একদমই ইচ্ছে করছে না শুভর, তাই কলটি কেটে দেয় সে। কানে হেডফোন দিয়ে গান ছেড়ে দেয়– 'মুছে যাওয়া দিনগুলো আমায় যে পিছু ডাকে...।' গান শেষে তার গ্রামের কথা খুব মনে পড়ে। সেখানে তার পরিবারের সবাই থাকে। পরিবার– এক আশ্চর্য মায়ার ইন্দ্রজাল! সারাদিনের সমস্ত ক্লান্তি শেষে পরিবারের প্রিয় মুখগুলোর সান্নিধ্য হৃদয়ে যে নির্ভরতা, আস্থা, ভালোলাগা কিংবা ভালোবাসার সৃষ্টি করে, তা কেবল হৃদয় দিয়েই অনুভব করা যায়। জীবিকা নির্বাহের তাগিদে শুভ তার পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন। বাবা-মা, স্ত্রী-সন্তান অর্থাৎ পরিবার ছেড়ে শুভকে ঢাকায় একা থাকতে হয়। সারাদিনের কর্মব্যস্ততা শেষে শুভ যখন তার রুমে ফিরে তখন ভীষণ একাকীত্ব ভর করে তার মনে। প্রযুক্তির কল্যাণে প্রায় প্রতিদিনই ভিডিও কলে পরিবারের সবার সাথে কথাবার্তা হয় ওর, যদিও এতে হাহাকার আরো বাড়ে! সবশেষে কষ্টরাই আঁকড়ে ধরে ওকে। দিনশেষে চেনা সেই আবদ্ধ রুম, চার দেয়ালের বন্দি সময়। শহরকেন্দ্রিক কর্মসংস্থানের কারণে এভাবেই শুভকে বাঁচতে হয় প্রতিনিয়ত।

আজ শুক্রবার। চাকুরিজীবিদের জন্য ঈদের দিনের মতো– বড়ই আনন্দের! যদিও শুভর ক্ষেত্রে এমনটা প্রযোজ্য নয়। অনেকের কাছে আজ ছুটির দিন হলেও শুভর জন্য মহা ব্যস্ততম একটি দিন– শুক্রবার। সকাল ৯টা থেকে ১২টা পর্যন্ত কোডার্স ট্রাস্ট, ঝিগাতলায় ক্লাস এবং বিকাল ৩টা–৬টা পর্যন্ত কলাবাগান এলাকায় ড্যাফোডিলের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান 'দিপ্তী' তে ক্লাস। অনেকটা শখের বশেই ফ্রিল্যান্সিং ও গ্রাফিক ডিজাইনের ফ্রাইডে ক্লাসে ভর্তি হয় শুভ। ফলাফল তিনটা মাসের সবগুলো শুক্রবার তার জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া। দুটি প্রতিষ্ঠানে ক্লাস শেষ ও শুরুর মাঝের সময়টা অর্থাৎ, '১২টা থেকে ৩টা'– এই তিন ঘণ্টা বিরতির সময় একান্তই শুভর। যদিও এই সময়টা কেটে যায় প্রার্থনা, আহার ও একটু বিশ্রামের মধ্য দিয়ে ধানমন্ডি লেক এলাকায়। এই জায়গাটার প্রতি তার মনের কোথাও অদ্ভুতভাবে একটা সফট্ কর্নার তৈরি হয়েছে। কোডার্স ট্রাস্টে ক্লাস শেষে হাঁটতে হাঁটতে শুভ চলে আসে নুরু ভাইয়ের খাবারের দোকানের সামনে। ঝিগাতলা সাইডে ধানমন্ডি লেকের ফুটপাতে নুরু ভাই ভ্যানে দুপুরের খাবার বিক্রি করে। লেকের ফুটপাতে বসে কিংবা ভ্যানের সামনে দাঁড়িয়েই লোকজন দুপুরের খাবার খায়। বেশ সস্তা এখানের খাবার! ঘড়িতে তাকিয়ে দেখতে পায়– এখনো একটা বাজেনি! এ কারণেই এ মুহূর্তে নুরু ভাইয়ের ভ্যানের সামনে তেমন ভিড় নেই। দুপুরের নামাজের পর ভিড় একটু বেশি হয়। তার কাস্টমার সাধারণত রিকশা চালক, দিনমজুর বা স্বল্প আয়ের মানুষজন। ফুটবলের মতো মোটা সাদা ভাত, মশুরের পাতলা ডাল এবং আলু ভর্তা প্যাকেজের কাস্টমারই বেশি। শুভ প্রায় প্রতি শুক্রবারেই নুরু ভাইয়ের দোকানে লাঞ্চ করে। ক্ষুধার্ত পেটে আলুভর্তার

প্যাকেজটা তার কাছে অমৃত মনে হয়! খাওয়া শেষে যথারীতি লেকের বেঞ্চে বসে পড়ে শুভ। দূরে লেকের পানিতে সূর্যের আলো যেন মুক্তোর মতো চিকচিক করে! সেদিকে তাকিয়ে শুভর হঠাৎ মনে পড়ে– গত সপ্তাহে দুপুরের বৃষ্টি কমার পর সে বসুন্ধরার তিনশ ফিটে তার বন্ধু মাসুদের কাছে গিয়েছিলো। মামুনও ওদের সাথে যোগ দিয়েছিলো। এরপর তিন বন্ধুর অকারণ আড্ডাটা সেদিন চলতে থাকে মধ্যরাত পর্যন্ত! এর মাঝেই চলে মোটরবাইক প্রশিক্ষণও। মাত্র একদিনেই শুভ মোটরবাইক চালনা রপ্ত করে নেয়। দারুণ একটা সময় কাটে সেদিন! মোটরবাইক চালানোর সময় একটা ড্যাসিং ভাব চলে আসে, যদিও শুভর বাই সাইকেল চালাতেই বেশি ভালো লাগে। মোবাইলের এলার্ম জানিয়ে দেয়– ধানমন্ডির সবুজ বৃক্ষরাজির সুশীতল ছায়ায় আর বসার সুযোগ নেই, এবার যেতে হবে 'দিপ্তী' তে। শুভ ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান 'দিপ্তী'র উদ্দেশে পা বাড়ায়।

গ্রাফিক্স ও ফ্রিল্যান্সিং এর কোর্স শেষ। তিনটি মাস খুব দ্রুতই যেন শেষ হয়ে গেল। ধীরে ধীরে ধানমণ্ডি লেক এলাকার প্রতি মায়াটা কমতে থাকে শুভর। আসলে মানুষ প্রয়োজন ছাড়া কোনো কাজই করে না। প্রয়োজন শেষ হওয়ায় ওখানে আর যাওয়া হয় না শুভর। ইদানিং সাদুল্লাহপুরের কথা খুব মনে পড়ছে শুভর। তার প্রিয় স্থানগুলোর মধ্যে একটি হলো– এই গ্রাম। গ্রামটিকে লোকজন গোলাপ গ্রাম বলেই জানে। অন্তত এই গ্রামের বাইরের লোকজনরা এ নামেই বেশি চিনে স্থানটিকে। ঢাকায় এমন সুন্দর একটি স্থান আছে, চোখে না দেখলে বিশ্বাসই হয় না। আগামী মাস থেকে শুভর এমবিএর ক্লাস শুরু। হঠাৎই ভর্তি হয়ে গেল সে। ইদানিং এমন হঠাৎ হঠাৎ ঘটনাগুলো বেশি ঘটছে তার সাথে। তবে এ হঠাৎ নিঃসন্দেহে ভালো ফলই বয়ে নিয়ে আসবে। ক্লাস শুরুর পূর্বে একবার তাকে সাদুল্লাহপুরে যেতেই হবে, পরে হয়তোবা সময় আর পাবে না।

দিনটি শুক্রবার। দিয়াবাড়ি ঘাটে (মিরপুর বেড়িবাঁধ সংলগ্ন এলাকা) নৌকা সারিবদ্ধভাবে বাঁধা। একটি নৌকায় দু'চারজন বসে আছে। কিছুক্ষণ পর ইঞ্জিনচালিত নৌকাটি সাদুল্লাপুরের উদ্দেশে ছেড়ে যাবে। ভরা শ্রাবণ, তবু একফোঁটা বৃষ্টি নেই। তুরাগ নদীটারও করুণ দশা! এককালের পানিতে টইটুম্বুর তুরাগ এখন দখলদারের কবলে! দূরে তাকালে সরু খালের মতো মনে হয়! তবে নদীর পানিতে এ মুহূর্তে দুর্গন্ধটা একটু কম। শীত কিংবা গ্রীষ্মে এই নদী অনেকটা সরু খাল কিংবা ড্রেনে পরিণত হয়, তখন এখানে হাঁটুপানি থাকে এবং পানি থেকে বীভৎস দুর্গন্ধ ছড়ায়। একবার শীতের সময় ইঞ্জিন চালিত ছোট নৌকায় সাদুল্লাপুরে গিয়েছিলো শুভ। সে সময় এ নদীটিতে পানি ছিলো অনেকটাই কম। নানারকম পলিথিন ও আবর্জনায় নদীর পানি থেকে উৎকট একটা গন্ধ বেরুচ্ছিলো। নৌকা কিছুদূর যাওয়ার পরেই নৌকার নিচে থাকা পাখায় আবর্জনা আটকে ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যাচ্ছিলো বারবার। মাঝি সেই নোংরা

পানিতে নেমে পাখায় জড়ানো আবর্জনা পরিষ্কার করে আবার ইঞ্জিন স্টার্ট দিচ্ছিলো। এভাবে বেশ কয়েকবার আবর্জনা পরিস্কার করতে হয়েছিলো সেদিন। দেশের বড় বড় নদীগুলোর অনেক স্থানেই এখন নাব্যতা সংকট। এর সাথে যোগ হয়েছে নদীর পানিতে অস্বাভাবিক দূষণ। একদিকে পলিথিন, চিপসের প্যাকেটসহ নানারকম দ্রব্যাদি ডাস্টবিনের মতো নদীতে ফেলে লোকজন। তার উপর কিছু মিল/কলকারখানার বিষাক্ত কেমিক্যালমিশ্রিত দূষিত পানি নদীতে মিশে ঘটছে ভয়াবহ পানি দূষণ! ব্যাবিলন গ্রুপ এদিক থেকে ব্যতিক্রম এবং প্রশংসা পাবার যোগ্য। কোম্পানিটির স্লোগানই হচ্ছে– Spirit of Ethical Business। এখানের গার্মেন্টস ওয়াসের কেমিক্যালযুক্ত পানি বায়োলজিক্যাল ইটিপিতে শোধিত হয়ে শতভাগ নিরাপদ হয়ে চলে যায় পরিবেশে। এজন্য ব্যাবিলন গ্রুপের ইটিপি স্বনামধন্য ক্রেতা এইচঅ্যান্ডএম কর্তৃক একাধিকবার গ্রিন ইটিপির স্বীকৃতিও পেয়েছে। শুধু তাই নয় ব্যাবিলন গ্রুপের নিজস্ব ১৩টি আচরণবিধির মধ্যে অন্যতম প্রধান একটি হচ্ছে– পরিবেশ সংরক্ষণ। এ লক্ষে, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির অংশ হিসেবে পানি ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ক্যামিক্যালের ব্যবহারে স্থানীয়, আন্তর্জাতিক আইন ও ক্রেতাগণের আচরণবিধি মেনে হিগ এফইএম, কেয়ার ফর ওয়াটার, রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং, বৃক্ষরোপনসহ নানাবিধ টেকসই কর্মসূচিতে সক্রিয় অশংগ্রহণ রয়েছে ব্যাবিলন গ্রুপের। শুভ এই কোম্পানিতেই চাকরি করে। একজন ব্যাবিলনিয়ান হিসেবে শুভ তাই অত্যন্ত গর্ববোধ করে। যেদিন সমাজের প্রতিটি মানুষের পক্ষ থেকে ব্যক্তিগত সচেতনতা সৃষ্টি হবে, ম্যানুফ্যাকচারিংসহ অন্যান্য কোম্পানিগুলো– যাদের উৎপাদন কার্য প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে পরিবেশের ওপর প্রভাব ফেলে তাদের সমাজ ও পরিবেশের ওপর দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন শুরু হবে এবং সেইসাথে সরকারের পক্ষ থেকে গণসচেতনতা সৃষ্টিসহ পরিবেশ বিপণ্নকারীদের জন্য কঠোর আইনের বাস্তবায়ন নিশ্চিত হবে সেদিন নিশ্চয় সবাই ফিরে পাবে– একটি দূষণমুক্ত সুন্দর পরিবেশ, সুন্দর পৃথিবী!

নৌকা চলতে শুরু করেছে। যদিও শুভ সাঁতার জানে না তবু নৌভ্রমণে তার মনে কখনো ভীতি কাজ করেনি। একবার শিশুসন্তানসহ তার পুরো পরিবার লঞ্চযাত্রায় ঝড়ের কবলে পড়া ছাড়া। সেদিনের ঘটনা সে মনেও করতে চায় না কখনোই! নদীতে এখন পানি কিছুটা বেশি। নদীর সরু অংশেও এখন ভালোই পানি! সরু অংশ পেরিয়ে যখন প্রশস্ত অংশে প্রবেশ করে নৌকা তখনি নৌকাভ্রমণের আসল মজা শুরু হয়। প্রশস্ত নদীটাকে যেন ঠিক সমুদ্রের মতো মনে হয় শুভর! যতদূর চোখ যায় কেবল পানি আর পানি। প্রায় পঁয়ত্রিশ মিনিট চলার পর বাতাসে নদীর জল ছোঁয়া একটা শীতল স্পর্শ আর গোলাপের মৌ মৌ সুবাসে শুভ বুঝতে পারে– সামনেই সাদুল্লাহপুর, তার প্রিয় গোলাপ গ্রাম! পুরো গ্রামটিতে প্রচুর গাছপালা ও গোলাপ বাগানে পূর্ণ। গোলাপের বাণিজ্যিক আবাদ হয় এখানে।

এখানকার গোলাপ চলে যায় ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায়, এমনকি ঢাকার বাইরেও! একটা বাগানের সামনে দাঁড়ায় শুভ। সামনে এক টুকরো খোলা আকাশ আর চারপাশে গোলাপের মৌ মৌ গন্ধ। সব মিলে পরিবেশটা অসাধারণ। এ নৈসর্গিক সৌন্দর্য অনুভব করতেই এখানে শুভর ছুটে আসা। গোলাপের মিষ্টি সুবাসে একটা পবিত্র আমেজে কিছুক্ষণের জন্য যেন ভিন্ন এক জগতে চলে যায় তার মন! আজ 'শুক্রবার' বলেই এখানে আসতে পেরেছে শুভ। শুক্রবার– তার জন্য বিরাট কিছু! সপ্তাহের আর ছয়টি দিন কর্মব্যস্ত থাকার পরে আজ একটু নিজের মতো করে কাটাতে পারছে। তবে শুভ খুব সৌভাগ্যবান এজন্য যে, সে অন্তত একটি দিন নিজের মতো করে কাটাতে পারে। অনেকের জীবনে ছুটি বলতে কোনো শব্দ নেই। যে নৌকায় এখানে এসেছে তার মাঝি, সাদুল্লাপুরের চায়ের দোকানগুলো, রিকশা/গাড়ি, হকার এবং এরূপ আরো নানা পেশাজীবি মানুষের জীবনে 'সাপ্তাহিক ছুটি' বলতে কোনো শব্দ নেই। তাদের কাছে 'শুক্রবার' সপ্তাহের আর ছ'টা দিনের মতোই! এমন অনেক কোম্পানিও আছে, যাদের কোনো সাপ্তাহিক ছুটিও নেই। সাদুল্লাহপুরে সময়টা স্বপ্নের মতো কাটে শুভর। সবচেয়ে ভালো লাগে গোধূলি সময়ে বাগানের ভিতর দাঁড়িয়ে দুনয়নে আকাশের রক্তিম রূপ দর্শন! যেন গোলাপ বাগনটার ঠিক অপর প্রান্তেই সূর্যটা আস্তে আস্তে ডুবে যাচ্ছে! আগামী সপ্তাহের জন্য ফ্রেশনেস রিলোডের মতো টনিক হিসেবে কাজ করবে সাদুল্লাপুরের এ ভ্রমণ এতে কোনো সন্দেহ নেই।

দুদিন আগেই মিডটার্ম ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হয়েছে শুভর। গত চারমাসের মধ্যে সকল শুক্রবারে সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত তাকে এমবিএর ক্লাস করতে হয়েছে। মাঝে দুই ঘণ্টা আহার ও বিশ্রাম বিরতি ছাড়া। চারমাসে একবারও সে নিজের মতো করে কাটাতে পারেনি এই শুক্রবারটি কিংবা একবারের জন্য তার গ্রামেও যাওয়া হয়নি! এভাবে আরো একটা বছরের সবগুলো শুক্রবার তাকে বন্দি জীবন কাটাতে হবে। যদিও ভার্সিটিতে কাটানো শুক্রবারটা মন্দ হয় না। নতুন কিছু শেখা, নতুন মানুষের সাথে পরিচয়। ইদানিং বাড়িতে ফোন করলে মেয়েটা কথা বলতে চায় না, অনেক অভিমান তার। সারাক্ষণ তার মাকে প্রশ্ন করে– বাবা কেন বাড়িতে আসে না?

আজ শুক্রবার, আগামী পরশু ঈদ-উল-ফিতর। এটি মুসলমানদের অন্যতম বৃহৎ ধর্মীয় উৎসব। চারদিকে একটা উৎসব উৎসব আমেজ। এক মাস সিয়াম সাধনার পর বহু কাঙ্খিত এ ঈদ। অফিস থেকে প্রায় নয়দিন ছুটি মিলেছে, তবে ভার্সিটি থেকে পাঁচদিন। অর্থাৎ চারদিন আগেই তাকে ঢাকা ফিরতে হবে। ঢাকা শহরের সবগুলো বিপনি বিতান এমনকি ফুটপাতেও এ সময়ে প্রচণ্ড ভিড়। শেষ সময়ের কেনাকাটা চলছে। ইতোমধ্যে অনেকেই প্রিয়জনের সাথে ঈদের আনন্দ ভাগ করে নিতে গ্রামের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছে। কিছু লোক পরে যাবে, কেউ ঈদের দিন যাবে, কেউবা আবার যেতেই পারবে না। শুভ নিউ মার্কেটে তার মেয়ের জন্য ঈদের জামা খুঁজছে। এখন পর্যন্ত মেয়েটার

জন্য জামা কিনতে পারেনি। অনেকক্ষণ হাঁটা, সূর্যের প্রখর কিরণ এবং রোজা রাখায় প্রচণ্ড তৃষ্ণা পেয়েছে শুভর। যদিও রোজা রেখে পানাহারের কথা মনে করতে নেই।

যাত্রীছাউনির নিচে বিশ্রামের জন্য বসে শুভ। একটু দূরে মার্কেটের সামনের ফুটপাতে দু'পা বিহীন একজন মানুষ শুয়ে আছে। তার সামনে রাখা ভিক্ষার থালায় দু'একজন টাকা-পয়সা দান করছেন, তবে বেশিরভাগই পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছেন। টুপি পরিহিত একজন রিকশাওয়ালার সাথে একটি লোক কথা বলছে। হয়তোবা ভাড়া ঠিক করছেন। একটু পর রিকশায় উঠলেন তিনি, কপালের ঘাম মুছে ফেলে রিকশা নিয়ে ছুটে চললেন বৃদ্ধ রিকশাওয়ালা। প্রখর রোদে দাঁড়িয়ে একজন হকার মাস্ক বিক্রি করছেন। তার শার্ট ভিজে গায়ের সাথে লেপ্টে আছে। এদের মধ্যে অনেকের জীবনেই নেই কোনো শুক্রবার, ছুটি কিংবা উৎসব। ঈদের দিনও তাদের জন্য বছরের অন্যান্য দিনগুলোর মতোই স্বাভাবিক একটি দিন। এদিনও তারা এভাবেই ছুটে চলে জীবন কিংবা সময়ের প্রয়োজনে। মানুষের জীবনটা আসলে সময়ের সমষ্টি মাত্র। সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টা, দিন, সপ্তাহ, পক্ষ, মাস, বছর, যুগ, শতাব্দী, সার্ধশত... সর্বোচ্চ এ পর্যন্তই মানুষের দৌড়! উইকিপিডিয়ার তথ্যানুযায়ী পৃথিবীতে দীর্ঘসময় পর্যন্ত বেঁচে থাকা ব্যক্তির বয়স ছিলো ১২২ বছর এবং ১৬৪ দিন। সে অনুযায়ী পৃথিবীতে এ পর্যন্ত কেউ সার্ধশত (১৫০ বছর) ছুঁতে পারেনি। একটা সময় পর একদিন হুট করেই সে চিরতরে হারিয়ে যায় কালের অতল গহ্বরে। সময়টাকে আটকে রাখা যায় না কিছুতেই! যদিও কেউ কেউ তার নিজ কর্মের ফলে বেঁচে থাকে মানুষের স্মৃতিতে যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী। তারা জ্ঞানী, লেখক-সাহিত্যিক-কবি, মনীষী টাইপের মানুষ। শুভ অতি সাধারণ একজন মানুষ। তার চিরপ্রস্থানের পর হয়তো তার পরবর্তী দু'এক প্রজন্ম তার কথা মনে রাখতে পারে। তারপর পৃথিবীতে তার কথা কেউ মনে রাখবে না। শুভ তার দাদার দাদা সম্পর্কে কিছুই জানে না! কালের অতল গহ্বরে তার দাদার দাদা যেমন হারিয়ে গেছেন, তেমনি একদিন শুভর কথাও কেউ মনে রাখবে না। তবে যদি কেউ একজন আজ থেকে শতবর্ষ পরে 'ব্যাবিলন কথকতা'র ২০১৬–২০২১ এবং ২০২২ (লিখা ছাপা হওয়ার বিষয়টি এখনো নিশ্চিত নয়) এই ৬/৭টি সংখ্যার কোনো একটি বইয়ে তার লিখাটা পড়ে, তবে হয়তোবা সে জানতে পারবে– 'শুভ' নামের কেউ একজন ছিলো, যে তার নিজের মতো করে ভাবতো, লিখতো। তার নামটি চিরতরে হয়তোবা হারিয়ে যাবে না কোনোদিন। আজ থেকে শত বছর পরে শুভ বেঁচে না থাকলেও 'ব্যাবিলন গ্রুপ' নামের প্রতিষ্ঠানটি নিশ্চয়ই কোটি বছর পৃথিবীর বুকে টিকে থাকবে তার স্বনামেই। সেই সাথে বেঁচে থাকবে ব্যাবিলনের সাহিত্য পত্রিকা– ব্যাবিলন কথকতা। গার্মেন্টস শিল্পে সাহিত্যচর্চা বিষয়ক পত্রিকার প্রথম স্বপ্নদ্রষ্টাকেও নিশ্চয়ই সেদিন মানুষ বিনম্রভাবে স্মরণ করবে। শুভকে ভাবনার রাজ্য থেকে বাস্তবে ফিরিয়ে নিয়ে আসে ফোনকল। মেয়ের কল দেখে দ্রুত রিসিভ করে শুভ।

– বাবা, তুমি কখন আসবা?
– কাল আসবো আম্মু।
– না, এখনি আসো। তুমি এখনি রওনা দাও।
– তোমার জন্য এখনো জামা কিনতে পারিনি মা।
– আমার জামা লাগবে না, তুমি এখনি আসো।
শুভ মনে মনে ভাবে, পাঁচ বছর বয়সে মেয়েটি কীভাবে এত পাকনা কথা বলতে পারে!
– ঠিক আছে মা, আমি রওনা হচ্ছি। এখন রাখছি, পরে কথা বলবো।

ফোন কাটার পর শুভ কিছুক্ষণ তার মেয়ের কথা ভাবে। যেদিন এই পৃথিবীতে তার মেয়ের আগমন ঘটে সে দিনটি ছিলো শুক্রবার। কাকতালীয় হলেও সত্যি যে, শুভর নিজের জন্মদিনও- শুক্রবার! তাই শুক্রবার শুভর কাছে খুব প্রিয়। এ দিনেই মেয়েটির উপস্থিতি শুভর সাদাসিধে ও সাদাকালো জীবনে যেন রঙতুলির রঙিন আঁচড়, পৃথিবীর সব সুখ পাবার মতো ব্যাপার! মেয়েটিকে পেয়ে সৃষ্টিকর্তাকে কত যে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে মনে মনে, তার কোনো হিসেব নেই! শুভ তার জীবনটাকে যেন নতুন ও ভিন্নভাবে অনুভব করতে শিখেছিলো সেদিন থেকে। মেয়েটার মুখের দিকে তাকালে কেমন যেন একটা অপার্থিব মায়া অনুভব করতো শুভ! দেখতে দেখতে কেটে গেছে পাঁচটি বছর। মেয়ের প্রতি তার ভালোবাসার তীব্রতা এখন আরো বেড়েছে। গত মাসে তার মেয়ের জন্মদিন ছিলো। দিনটি শুক্রবার এবং ছুটির দিন হলেও ভার্সিটিতে পরীক্ষা থাকার কারণে শুভ উপস্থিত থাকতে পারেনি মেয়ের জন্মদিনে। মেয়ে তার বাবাকে ছাড়া কিছুতেই কেক কাটবে না। সবাই অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সেদিন কেক কাটিয়েছিলো মেয়েকে দিয়ে। পরদিন খুব ভয়ে ভয়ে মেয়েকে ফোন দেয় শুভ।
– আম্মু, কেমন আছো?
– তুমি পঁচা, তুমি আমার জন্মদিনে আসোনি, তোমার সাথে আমার কোনো কথা নেই!
ফোনেই মেয়ের সে কী কান্না! সময় ও জীবনের প্রয়োজনে শুভর প্রিয় 'শুক্রবার' দিনটিকে বিসর্জন তার ছোট্ট মেয়ে বুঝবে কীভাবে!

কার কাছে যেন একটা কথা শুনেছিলো শুভ– একজন মানুষ তখনি সত্যিকারের বাবা হয়, যখন সে মেয়ের বাবা হয়! কথাটা পুরোপুরি ঠিক! মেয়ের ছোট ছোট আবদারগুলো মিটাতে পারলে শুভর ভীষণ খুশি লাগত। তার মেয়েটি রিকশায় চড়তে খুব ভালোবাসতো। কোনো এক শুক্রবারে মেয়ের আবদারে রিক্সায় চড়ে তাকে নিয়ে বাজারে গিয়েছিলো শুভ। প্রচণ্ড রোদের উত্তাপে মেয়ে খুব পিপাসার্ত ছিলো বুঝতে পেরে শুভ তাকে একটি দোকানে ফ্যানের বাতাসের নিচে বসায় এবং তার হাতে ঠান্ডা ম্যাংগো জুসের একটি প্যাকেট দেয়। শুভ দোকানের একটি বেঞ্চের ওপর বসে। টেবিলে দেখতে পায়– 'শুক্রবারের প্রথম আলো।' পত্রিকায় চোখ বুলাতেই একটি ছোট্ট ছেলে শুভর কাছে টাকা চায়। পত্রিকা পড়ায় মনোযোগ থাকায় শুভ ছেলেটাকে 'যা বেটা' বলে ফিরিয়ে দেয়। ছেলেটি চলে যাওয়ার পর মেয়ে হঠাৎ জুস পান করা বন্ধ

করে বলে,
– বাবা, গরিব মানুষকে এভাবে বলতে হয় না।
মেয়েটির কথা শুনে পত্রিকাটি টেবিলের ওপর রেখে মেয়ের দিকে তাকায় শুভ। দোকানদার একবার শুভর দিকে আরেকবার তার মেয়ের দিকে তাকাচ্ছিলো। মেয়ের কথা শুনে শুভ তো রীতিমতো হতভম্ব! মনে মনে খুব লজ্জা পায় এবং ভাবে– কীভাবে তার মেয়ে এ ব্যাপারটা শিখলো! অপরাধীর মতো শুভ তার মেয়েকে বলে,
– সরি, মা। আর কখনো এমন হবে না।

মেয়ে ওর কথা শুনে মুচকি হাসে এবং আবার জুসে চুমুক দেয়। শুভ অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মেয়ের দিকে...

মা

মো. কামরুল হাসান
অফিসার, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং
ব্যাবিলন প্রিন্টার্স লিমিটেড

মা আমার মা,
এই কথাটি ভুলতে পারি না।
মা আমায় বকে
তবুও সে আদর করে ডাকে।

মায়ের স্নেহ, মায়ের ভালোবাসা
আমায় নিয়ে তার অনেক গর্ব এবং আশা।

মা আমায় শেখায় হাঁটতে
শেখায় কথা বলতে,
শেখায় আমায় এই সমাজে
কীভাবে হয় চলতে।

মায়ের প্রতিটি মুহূর্ত করবো স্মরণ,
আশীর্বাদ নিয়ে ছুঁয়ে চরণ,
রয়েছে তার কত স্বপন
সব করবো রক্ত দিয়ে পূরণ।

আমার এক চিলতে সুখ

তরিকুল ইসলাম
অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, মার্কেটিং অ্যান্ড মার্চেন্ডাইজিং
ব্যাবিলন গ্রুপ

হয়তো আর দেখা হবে না!
কথা? হয়তো, অথবা না।
হাঁটা হবে না পাশাপাশি আর,
হাতে হাত রাখা? হবে না হয়তো আর!

সমুদ্র দেখা, পাহাড় দেখা,
হবে না হয়তো একসাথে বসে,
আবেগে ভেজা হবে না আর বৃষ্টিতে।

রাত গভীর হলেও আর
হয়তো তাকানো হবে না একসাথে আকাশ পানে!
তারাদের লুটোপুটি, জোছনা বিলাসে,
শিহরণ জাগনিত হবে না মনে।

তোমার হাত ধরে, নিকষ অন্ধকারে,
বলা হবে না কভু -
অনেক বেশি ভালোবাসি তোমায়।

আজ থেকে শত সহস্র বছর ধরে,
দুজনের বসবাস দু'মেরুতে।
ব্যস্ত থাকো তোমার তুমিতে,
আমি থাকি বৃত্তের বাইরে।

ভালো থেকো, থাকতেই হবে তোমায়,
আমার এক চিলতে সুখে।

আমার বাবা

মো. সাদ্দাম আলী
সুপারভাইজার, সুইং
অবনী ফ্যাশন্স লিমিটেড

আমার বাবা সবার সেরা
আমার বাবা ভালো,
আঁধার রাতে চলার পথে
বাবাই আমার আলো।

বাবার কাছে আমার প্রথম পড়ালেখা শুরু,
বাবাই আমার এই জীবনে প্রথম শিক্ষা গুরু।
বাবার ঘামের বিন্দুগুলো আহার যোগায় মুখে,
বাবাই আমার আশার প্রদীপ সকল সুখে দুখে।
রোজ সকালে শুনি বাবার কোরআন পড়ার সুর,
বাবার ভালোবাসায় সকল ক্লান্তি হয় দূর।
বাবার কাছে আমি এখন অনেক অনেক ঋণী,
বাবার দেওয়া আশীর্বাদে সফলতা কিনি।
বাবার মুখের মিষ্টি হাসি বড্ড ভালোবাসি,
সারাজীবন বাবার সেবায় রাখবো জীবন বাজি।

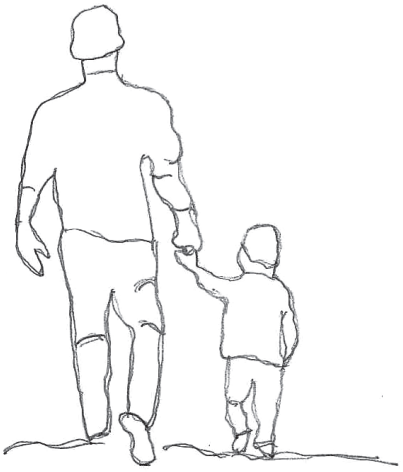

আমার বাবা সেরা বাবা
সবার থেকে ভালো,
আমার বাবা আমার কাছে
দুই নয়নের আলো।

ফেরারি স্মৃতি

শরীফ রাজ
সিনিয়র ম্যানেজার, কর্পোরেট এইচআর
ব্যাবিলন গ্রুপ

তারা ভরা রাত নির্জন চারদিক,
নির্ঘুম বসে আছি স্বপ্নভঙ্গের স্মৃতি নিয়ে।

স্মৃতিগুলো এখনো মনে পড়ে,
এখনো স্বপ্ন আঁকি আলোকিত জ্যোৎস্নায়,
এখনো স্বপ্ন দেখি ফেরারি স্মৃতি নিয়ে,
কখনো মনে হয় স্বপ্ন সে তো অবাস্তব,
তবুও স্বপ্ন আঁকি, প্রবোধ দেই মনকে।

মনে পড়ে ফেলে আসা দিনের কথা,
মনে পড়ে সে দিনের খামখেয়ালিপনা,
কখনো অভিমানে চোখের কোণে জল ভরে ওঠে।

নিজেই নিজেকে প্রবোধ দেই
কখনো নীরবে নির্ঘুম রাত কেটে যায়
তবুও স্বপ্ন আঁকি ক্লান্ত চোখে,
তারা ভরা রাত নির্জন চারদিক
নির্ঘুম বসে আছি একাকী।

ছুটি

এম এম তোফাজ্জল হোসেন
এজিএম, ফ্যাক্টরি অপারেশন্স
অবনী ফ্যাশন্স লিমিটেড

- কী ব্যাপার কামাল সাহেব, আপনি? আপনি না ছুটি নিয়েছেন? এখনো অফিসে কী করছেন?

চিরচেনা সেই অকৃত্রিম প্রাণ ভরা হাসি দিয়ে জবাব- কিছু কাজ বাকি আছে, কাজগুলো শেষ করেই চলে যাবো।

- আপনার কপালে ব্যান্ডেজ কেনো?

আবারো একটু হেসে চশমার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে বললেন- এই একটু ব্যথা পেয়েছি। বলেই আবারো হাসতে লাগলেন তিনি।

তার হাসি শুনছি অথচ অকে চোখের সামনে দেখছি না। এই মাত্রইতো কথা হলো

- কোথায় গেলেন কামাল সাহেব? কামাল সাহেব.....

- এই কী হয়েছে তোমার? কাকে ডাকো এত রাতে?

শোয়া থেকে লাফ দিয়ে উঠে বসে পড়লাম, ঘামছিলাম খুব। ঘরের চারপাশটা ভালো করে দেখলাম। নীল নিয়ন আলোয় স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম, আমি কি তাহলে স্বপ্ন দেখছিলাম? হুম, স্বপ্নই। ভুলতে পারছিনা, যেনো ভুলতে চাইছিই না, হয়তো ভোলা যায়না।

১৯ জুন ২০২২ রোজ রবিবার, প্রতিদিনের মত অফিসে এসেই সবার আগে ফিনিশিং সেকশনে কামাল সাহেবের রুমে বসার অভ্যাস। আজও তাই করলাম। হাস্যোজ্জ্বল মানুষটির মুখটি আজ কোনও এক অজানা কারণে বেশ মলিন। কারণ জানতে চাইলে বললো- শরীরটা বেশি ভালোনা। তার উপর আজ বড় মেয়ের এসএসসি পরীক্ষা, আবদার করছে জীবনের প্রথম পরীক্ষা, যেনো আমি পরীক্ষাকেন্দ্রে নিয়ে যাই। কী করবো?

- কী করবেন মানে? চলে যাবেন! সকালের কাজটা কাউকে বুঝিয়ে দিয়ে যত দ্রুত সম্ভব বের হয়ে যান।

সকাল ১১.৩০ মি., কামাল সাহেবের নাম্বার থেকে ফোন আসলো।

- জি, বলেন।

- একটা দারুণ খবর আছে। আজকে সকাল থেকে এমন কাজ শেষ করলাম আপনি শুনলেতো খুশি হয়ে যাবেন।

- আপনাকে তো ছুটি দিলাম, আপনি যাননি?

- না, ভাবলাম কাজটা শেষ করেই বের হবো। আর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মেয়ের পরীক্ষা পিছিয়ে গেছে। তাই ভাবলাম পরেই বের হই।

তারপর আমি আমার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। দুপুর ২.২৯মি., কামাল সাহেবের ফোন।

- আমি তাহলে বের হচ্ছি। শরীরটা খুব খারাপ লাগছে।

- ওকে। টেক কেয়ার।

দুপুর ২.৪৪ মি., কে যেন ফোন দিয়ে জানালো কামাল সাহেব বিডিএল এর সামনে অ্যাকসিডেন্ট করেছেন। শোনা মাত্র যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কথাটা বার বার মাথার ভিতর প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। তাড়াতাড়ি এইচআর ম্যানেজার, সুমন আর তানভীর সাহেবকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। দুর্ঘটনার স্থানে গিয়ে হাত পা অসাড় হয়ে আসছিলো। নিজের চোখের সামনে ঠিক ওই মুহূর্তে নিথর দেহের যে মানুষটিকে দেখছি, কিছুক্ষণ আগেও তো তার সাথে কথা বলেছিলাম। যেন জীবনের কাছে হেরে যাওয়া একটি ক্লান্ত শরীর নিশ্চিত ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছে। দুর্ঘটনার কোন আঁচড় নেই কোথাও। শুধুমাত্র কান দিয়ে গড়িয়ে ঘাড় হয়ে মাথার নিচ পর্যন্ত বয়ে যাচ্ছে লোহিত রক্তধারা। তখনই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলাম আমাদের হয়তো আর কিছুই করার নেই। ভিতরটা দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছিলো। সেই অনুভূতি বোঝানোর মতো নয়। নিজেকে সামলে নিলাম, ভিতরের চিৎকার করে কাঁদতে থাকা কষ্টগুলোকে সান্ত্বনা দিলাম, কারণ আমাকে শান্ত থাকতে হবে। হাসপাতালে নেয়া থেকে শুরু করে সব ধরনের আনুষ্ঠানিকতা চলছিলো নিয়মানুযায়ী। মেয়ের জীবনের প্রথম পরীক্ষার দিনে নিজে উপস্থিত থেকে তাঁর সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে যে হাত বাড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, সেই হাত এখন নিথর। জগৎ সংসারের সব মায়া কাটিয়ে চলে গেলেন তিনি। ছুটি নিয়েছিলেন অফিস থেকে কিন্তু কে জানতো ছুটি হয়ে যাবে চিরদিনের জন্য?

যে মানুষটিকে বিদায় দিলাম, তিনি তো চলে গেলেন। সেইদিনই আবার অফিসে ফিরে এসে তাঁর রেখে যাওয়া কর্মস্থলে ফিরে আসলাম। সেকশনের সবাইকে ডেকে সমবেদনা জানালাম, সমানভাবে

ব্যথিত হলাম। সেকশনের ছেলেমেয়েগুলোর অশ্রুসিক্ত সেই চোখগুলো আজও মনে পড়ে। সেই দিন কেউ চিৎকার করে কেঁদেছিলো কি না জানি না, কিন্তু প্রতিটি চোখ যেনো চিৎকার করতে করতে বলছিলো..... 'আমাদের অভিভাবক কে হবেন? কে আমাদের পাশে ঢাল হয়ে দাঁড়াবেন? আমরাতো একসাথে এতিম হলাম।'

আমার পজিশন সেইদিন আমাকে ভেঙে পড়তে দেয়নি। কারণ আমি ভাঙলে ভেঙে পড়বে অনেক কিছু। বাসায় গিয়ে স্ত্রীকে বললাম আমাকে একটু একা থাকতে দাও প্লিজ। ঠিক কতক্ষণ জানিনা, তবে ওইদিন হয়তো জীবনের সর্বোচ্চ অশ্রু ঝরেছিলো। অশ্রু ঝরেছিলো একজন সহকর্মীর জন্য, একজন ভাইয়ের জন্য, একজন অভিভাবকের জন্য, একজন বন্ধুর জন্য, একজন পরামর্শদাতার জন্য।

২০০৬-২০২২ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১৬টি বছর একসাথে পথচলা, বয়সে ছোট হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমাকে তার বস হিসেবে যে সম্মান করতেন তা ছিলো উদাহরণ দেয়ার মতো। যে কোন পরিস্থিতিতে তাকে দেখেছি অনেক বেশি শান্ত আর স্বাভাবিক থাকতে। হাসি মুখে মেনে নিতেন রাগের মাথায় বলে ফেলা অযাচিত কথা গুলো। ব্যবসায়ের কঠিন সময়ে তিনি সব কিছু সামলে নিতেন ঠান্ডা মাথায়। শিপমেন্ট সংক্রান্ত কোন জটিলতায় একাই সকল পেরেশানি মোকাবিলা করতেন।

করোনার কঠিন পরিস্থিতিতে যখন পুরো বিশ্ব স্থগিত হয়ে পড়েছিলো, অফিস আদালত, কর্মস্থল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সব বন্ধ, প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হতো না কেউই, তখন আমরা যারা পোশাক শিল্পে কাজ করি আমরা আসতাম কর্মস্থলে। জীবনের মায়ার চাইতে তখন শিল্প টিকিয়ে রাখার প্রত্যয় ছিলো বেশি। সেই সময় একদিন কামাল সাহেব বলেছিলেন, এই যে এত চ্যালেঞ্জ এর মধ্যে আমরা কাজ করছি কোম্পানিকে টিকিয়ে রাখার জন্য, আমাদের যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে আমার পরিবার আর আমার ছেলেমেয়েদের কে কি কোম্পানি দেখবে? সেদিন কেনো যেন তার কথাগুলো ভিডিও করেছিলাম।

সেদিন কি তিনি জানতেন তার কথাগুলো এভাবে সত্যি হয়ে যাবে? না ফেরার দেশে এভাবে চলে যাবেন তিনি?

লিও টলস্টয়ের একটা গল্পে পড়েছিলাম, কোন এক দেবদূতকে শাস্তি স্বরূপ ঈশ্বর পৃথিবীতে মানুষরূপে পাঠিয়েছিলেন। তাকে বলেছিলেন, মানুষের জীবনের তিনটি সত্য খুঁজে নিতে। আর উত্তর পেলেই আবার দেবদূত রূপ ফিরে পাবেন তিনি।

১ম- মানুষের কী আছে?

২য়- মানুষের কী নেই?

৩য়- মানুষ কী নিয়ে বাঁচে?

মানুষের পৃথিবীতে এসে মানুষরূপে মানুষের মাঝে থেকে দেবদূত (মিখাঈল) এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজে

পেয়েছিলেন। তিনি উত্তরে যা পেলেন তা হলো -

১ম- মানুষের আছে প্রেম, ভালোবাসা। মানুষ মানুষকে অসম্ভব রকম ভালোবাসতে পারে।

২য়- মানুষের যা নেই তা হলো জীবনের নিশ্চয়তা। কার কখন জীবন প্রদীপ নিভে যাবে এইটা জানার ক্ষমতা মানুষের নেই।

৩য়- মানুষ আশা নিয়ে বাঁচে, মানুষ প্রেমে বাঁচে, মানুষ বাঁচে ভালোবাসায়।

মৃত্যু আমাদের জীবনের এক অমোঘ সত্য। এটাকে মেনে নিতেই হবে। উনার রেখে যাওয়া ওয়ারিশদের মহান সৃষ্টিকর্তা ধৈর্য্য ধারণ করার তৌফিক দিন। আমি এবং আমরা অবনী ফ্যাশন্স লিমিটেড এর সবাই চেষ্টা করবো আমাদের সাধ্যানুযায়ী তাদের পাশে থাকার। যা আমাদের হাতে আছে তার ত্রুটি আমরা করবোনা, আর যা হাতে নেই তার জন্য শুধুই সবুর। কামাল সাহেব ছুটি নিয়েছেন, চিরদিনের জন্য। সেই ছুটি কাটিয়ে ফিরে আসার কোন সাধ্য কারো নেই। আমরা দোয়া করি তার জন্য, তার আত্মার শান্তির জন্য। মরে গিয়েও তিনি আমাদের কাছে অমর হয়ে রইবেন তার ব্যবহার, তার ভালোবাসার মধ্য দিয়ে। ওপারে ভালো থাকবেন।

সফর অথবা শিক্ষা সফর

রুমানা আক্তার
অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, হিউম্যান রিসোর্সেস
ব্যাবিলন গ্রুপ

আমি যতবারই ট্যুর এ যাই ততবারই কিছু না কিছু নাটকীয় ঘটনা ঘটে। তেমনি কিছু ঘটনার সমীকরণে তৈরি হলো এবারের গল্প...

(ঘটনা ১)

ঢাকা থেকে ব্যাংকক পৌঁছে কানেকটিং ফ্লাইট ধরে চলে গেলাম ফুকেট। রিসোর্টে চেকইন করে আমাদের রুমে পৌঁছতে বেজে গেলো রাত প্রায় এগারোটা। রিসোর্টটি ছিল একটু নির্জন এলাকায়, আর আমাদের রুম ছিল রিসোর্টের একদম শেষ মাথায়, তাও আবার টিলার ওপরে। যেখান থেকে যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম হলো রিসোর্টের শাটল। ফুকেটে থাকতে গেলে বাংলা রোডের আশেপাশের এলাকাই আমাদের পছন্দের, কিন্তু এবারে শেষ সময়ে ট্যুর প্ল্যান করায় অনেক বেশি অপশন ছিল না। যাহোক, রুম দেখে আমাদের ভালো লাগলো, রুমের প্রতিটা জিনিসই কিছুটা অ্যান্টিক ধরনের। ভাবলাম এর বিশাল বারান্দায় বসে কফি খেতে খেতে আন্দামান সাগর দেখা যাবে, তা-ই বা মন্দ কি! সারাদিনের জার্নিতে আমরা ভীষণ ক্লান্ত, বিশেষ করে আমার সাড়ে তিন বছরের ছেলে, রিয়াসাতের ঘুমের সময় হয়ে গেছে। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নেই ফ্রেশ হয়ে রুমেই কিছু খাবার অর্ডার করে খেয়ে বিশ্রাম নেবো।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ কী এক অস্বস্তিতে আমার ঘুম ভেঙে গেলো। ঘড়ি দেখলাম, রাত তিনটা বাজে। মনে হলো ভীষণ শীত লাগছে, বেডসাইড মনিটরে দেখলাম এসির তাপমাত্রা ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ভাবলাম এটা নিশ্চয় আমার ছেলের কাজ! বৃষ্টি হওয়ায় এমনিতেই আবহাওয়া কিছুটা ঠান্ডা। এসিটা অফ করে বারান্দার দরজাটা খুলে দিলাম। আমি এমনিতে খুব সকালে ঘুম থেকে উঠতে পারি না, কিন্তু একবার ঘুম ভেঙে গেলে আর ঘুম আসেও না সহজে। কফির পানি গরম করতে দিয়ে ওয়াশরুমে গিয়ে দেখি বাথটাবের কল ছেড়ে রাখা, পানি উপচে ফ্লোর ভেসে যাচ্ছে। একবার একটা হরর ফিল্ম দেখার পর থেকে আমার বাথটাব ভীতি হয়েছে। কোনোমতে কলটা বন্ধ করে রিয়াসাতের বিছানায় গিয়ে বসলাম। এটা খুব অস্বাভাবিক কিছু না, আমার হাসবেন্ড প্রায়ই ওয়াশরুমের কল বন্ধ করতে ভুলে

যায়, তবুও আমার ভীষণ গা ছমছম করছিলো। ভাবনাটা অন্যদিকে ঘোরাতে একটা বই নিয়ে পড়তে শুরু করলাম। একটু পরে আলো ফুটতে শুরু করলো, চারদিকের অপার্থিব সৌন্দর্য দেখে কিছুক্ষণ আগের ঘটনা কিছুই আর আমার মনে থাকলো না।

থাইল্যান্ডে বর্ষাকাল চলছে, একটু পরপর থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে। আন্দামান সাগর প্রচুর উত্তাল, সেদিন ফুকেট ছেড়ে যায়নি কোনো স্পিডবোট অথবা ফেরি। আমরা একটু চিন্তায় পড়লাম, পরদিনই আমাদের ফেরিতে করে ক্রাবি যাবার কথা। সেদিন আমরা সারাদিন ফুকেটের সব দর্শনীয় স্থানে গেলাম, বিকেলে সুইমিং পুলে নামলাম, সন্ধ্যায় বাংলা রোডে গেলাম, বিচে ঘুরে বেড়ালাম, রাতের খাবার খেয়ে রুমে ফিরে আসলাম। ফ্রেশ হয়ে ঘুমোতে যাবো তখন মনে পড়লো আগের রাতের কথা। আমার হাসবেন্ডকে জানালাম, কিন্তু তার মতে- 'সারাদিন হরর ফিল্ম দেখলে এরকম হওয়াটাই স্বাভাবিক।' কথা না বাড়িয়ে ঘুমাতে চলে গেলাম, এবং সেই রাতেও আমার ঘুম ভেঙে গেলো। রুম প্রচণ্ড ঠান্ডা, এসি চলছে ১৬ তে। অথচ আমার স্পষ্ট মনে আছে এসি ২৪ এ দেয়া ছিল এবং রিয়াসাত কাল রাতে আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। তখন রাত ৩টা ১৫ বাজে। ওদিকে বাথরুমেও পানি পড়ার শব্দ, আমিতো রাতে ঘুমাবার আগে সব চেক করেই ঘুমিয়েছিলাম। তাহলে? আমি আমার হাসবেন্ডকে ঘুম থেকে ডেকে তুললাম কারণ ও নিজেও জানে রাতে এসি কতোতে ছিল আর ওয়াশরুমে কলও বন্ধ ছিল। ওকে বলতে বলতেই টিভি অন হয়ে গেলো এবং হাই ভলিউমে চলতে থাকলো, ঠিক যেরকম টা ভূতের সিনেমাতে দেখায়। বিকট শব্দে টিভি চলার কারণে রিয়াসাত ঘুম ভেঙে উঠে ভয় পেয়ে কান্না শুরু করলো। এবারে আর ইফতি (আমার হাসবেন্ড) আমাকে কিছু বললো না। পানির কল, টিভি, এসি বন্ধ করে আমাকে ব্যাগ গুছিয়ে নিতে বললো। যদি আবহাওয়া ঠিক নাও থাকে, আমরা কাল সকালেই এখান থেকে চেক আউট করবো।

(ঘটনা ২)

ক্রাবি আর ফি ফি আইল্যান্ডের সৌন্দর্য্য বর্ণনাতীত, তাই আর সে বৃত্তান্তে গেলাম না। আর তাছাড়া ওই দিনগুলোতে উত্তাল সমুদ্রযাত্রা ছাড়া আর তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনাও ঘটেনি। তবে প্রায় ১০ দিনের থাইল্যান্ড যাত্রা শেষ হলো ব্যাংককে এক ভয়ঙ্কর ঘটনার মধ্য দিয়ে।

১৬ জুলাই, ২০২২। রিয়াসাতের প্রথম সাফারি ওয়ার্ল্ড এবং সি-ওয়ার্ল্ড দেখা, যেটা নিয়ে সে ভীষণ এক্সসাইটেড। পরদিন সকালে আমাদের ঢাকার ফ্লাইট ধরতে হবে, রুমে ফিরে ব্যাগ গোছাতে হবে। তাই সেদিন একটু আগেভাগেই রাতের খাওয়া সেরে রুমে ফিরে যাই। ব্যাংককে আসলে সাধারণত আমরা এই হোটেলেই থাকি।

রাত ১০ টা বাজে, মোটামুটি সব গুছিয়ে ফেলেছি। রিয়াসাত ঘুমিয়ে পড়েছে, ইফতিও ঘুমাবার প্রিপারেশন নিচ্ছে।

ভাবলাম সেভেন ইলেভেনে (একটি চেইন সুপার শপ) গিয়ে কিছু শ্যাম্পু আর লোশন কিনে আনি! ইফতিকে বলে পার্স আর রুমের চাবিটা হাতে নিলাম, এমন সময় আমার ফোন বেজে উঠলো। আমার এক ব্যাংকক প্রবাসি ফ্রেন্ড আমাদের সাথে দেখা করতে এসেছে, নিচের লবিতে অপেক্ষা করছে। যেহেতু রিয়াসাত ঘুমাচ্ছে, ইফতিকে রুমেই থাকতে হলো ওর সাথে। আমি ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ফিরবো বলে নিচে নেমে গেলাম।

আমার ফ্রেন্ডকে সাথে নিয়েই সেভেন ইলেভেনে গেলাম, কেনাকাটা শেষ করে দুইটা কোকোনাট আইসক্রিম নিয়ে আবার হোটেল লবিতে ফেরত আসলাম। এবারের ব্যাংকক আমার কাছে কেমন যেন অচেনা লাগছিলো। রাত ১২ টা না বাজতেই সব চুপচাপ, দোকানপাট বন্ধ। গল্প করতে করতে আইসক্রিম শেষ করলাম, বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে লিফটের দিকে পা বাড়ালাম। লবির ঘড়িতে দেখলাম রাত ১২ টা বেজে ১০ মিনিট। আমরা এবার উঠেছি হোটেলের এক্সটেনশন বিল্ডিং-এ। এটা তুলনামূলক ভাবে নতুন হলেও, এদিকটায় মানুষের আনাগোনা খুব কম। লিফটের সামনে এসে দেখলাম আমি শুধু পার্স নিয়ে রুম থেকে বের হয়েছিলাম। বন্ধুর সাথে ফোনে কথা বলার পরে রুমের চাবি, আমার মোবাইল, দুটোই ভুলে ফেলে এসেছি রুমে। চাবি ছাড়া তো লিফটেও উঠতে পারবো না। লিফটের পাশেই একটা ইন্টারকম পেলাম, রুমের নাম্বারে ডায়াল করলাম, বেজে গেলো, কেউ ধরলো না। ঘুমিয়ে পড়েছে মনেহয়! এমন সময় আমার উচিত ছিল রিসেপশনে গিয়ে আরেকটা চাবি নিয়ে আসা। কিন্তু সেটা না করে আমি যেটা করলাম...

এক ভদ্রলোককে দেখলাম লিফটের দিকে এগুতে, আমিও উনার সাথে সাথে লিফটে উঠলাম। উনি ১৭ তে কার্ড পাঞ্চ করলেন। আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম, কারণ আমার ফ্লোর ও ১৭। লিফট থেকে নেমে রুমের বেল টিপতে যাবো তখন মনে পড়লো আমার ফ্লোর তো ১৬, একারণেই আমি যখন একটু আগে ভুলে ১৬...এর বদলে ১৭...নম্বরে ডায়াল করেছিলাম, কেউ ফোন তোলেনি। লিফটে আমার সাথে থাকা ভদ্রলোক অলরেডি উনার রুমে ঢুকে পড়েছেন। এবারে উপায়! এই ফ্লোরে যদি সারারাত কেউ না আসে বা এই ফ্লোরের কেউ তার রুম থেকে যদি না বের হয় তাহলে কি আমাকে এখানেই থাকতে হবে! এ পর্যায়ে আমি যেটা করতে পারতাম সেটা হলো লিফটের দিকে নজর রাখা; যেহেতু এটা ২৬ তলা বিল্ডিং, ওপর থেকে কেউ নিচে নামলে বা নিচ থেকে কেউ লিফট কল করলে তখন সেই লিফটে নিচে নেমে যাওয়া। এখানেও আমি আবার ভুল করলাম। আমি লিফটে না উঠে সিঁড়ি খোঁজা শুরু করলাম ভাবলাম একটা ফ্লোরই তো, সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেই হলো (যেন ওটা হোটেল না, আমার নিজের বাড়ি, ইচ্ছে মতো যেখানে খুশি সেখানে যেতে পারবো)। খুঁজতে খুঁজতে একটা সিঁড়ি পেয়ে গেলাম। নতুন বিল্ডিংটা মেইন বিল্ডিংয়ের সাথে শুধুমাত্র নিচতলায় কানেক্টেড, দুইটার লিফট বিল্ডিংয়ের দুই দিকে, এই বিল্ডিং এর আলাদা কোনো

রিসেপশন নেই, এমনকি কোনো রেগুলার সিঁড়িও নেই। যেটা আছে সেটা হলো ইমার্জেন্সি এক্সিট। তাড়াহুড়ায় আমি ইমার্জেন্সি সাইন না দেখেই নিচে নামতে শুরু করলাম। এক ফ্লোর নিচে নেমে যখন বের হতে যাবো তখন দেখলাম এক্সিট ডোর ভেতর দিকে খোলে না। যা বোঝার বুঝে গেলাম! এই ডোর দিয়ে বের হতে গেলে ১ম ফ্লোরে যেতে হবে, এমনকি আমি যে ফ্লোর থেকে মাত্র আসলাম, সেখানেও এখন ফিরে গিয়ে কোনো লাভ নেই। হাতে ব্যাগভর্তি শ্যাম্পু আর লোশন নিয়ে আমি ১৭ তলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে শুরু করলাম। এমনিতে ১৭ তলা থেকে নামাটা আমার জন্যে কোনো ব্যাপার না। কিন্তু ওই সিঁড়িগুলো ছিল স্বাভাবিকের তুলনায় একটু বেশি খাড়া আর আমিও একটি লং স্কার্ট পড়েছিলাম তাই নামতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিলো। তার উপর অমন গরমে এসি কিংবা ফ্যান কোনোটাই নেই। যাহোক, কোনোমতে নিচে এসে পৌঁছলাম কিন্তু আমি তখনো জানি না আমার কষ্ট শেষ হতে আরো দেরি আছে...

নিচতলায় এক্সিট ডোরে চাপ দিতেই খুলে গেলো আমিও ভাবলাম এ যাত্রায় বোধহয় বেঁচে গেলাম, কিন্তু না!! এরপরে আরেকটা সিকিউরিটি ডোর আছে যেটা লক করা। এত বড় একটা হোটেলের ইমার্জেন্সি এক্সিটের এই অবস্থা! আমি আবার সিঁড়িতে এসে বসে পড়লাম। এবারে আমার ভয় করতে লাগলো। কী করবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না। আমার মাথা অনেকক্ষণ থেকেই কাজ করছে না আর সেই কারণেই একের পর এক ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এরকম সময়ে আমার অনেকটা প্যানিক অ্যাটাকের মতো হলো। খুব দমবন্ধ লাগছিলো, মাথা ঘুরে সিঁড়িতেই পরে থাকলাম অচেতন ভাবে। এভাবে কতক্ষণ কেটেছে জানি না। যখন আমার সেন্স কাজ করা শুরু করলো তখন বুঝতে পারছিলাম না রাত কয়টা বাজে। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে, কিন্তু এক ফোঁটা পানিও নেই আমার কাছে। ভাবলাম ইফতি আর রিয়াসাত কী করছে! ওরা কি এখনো ঘুমিয়ে আছে! নাকি আমাকে খুঁজছে! কাল সকালে ফ্লাইট! আমি যে ইমার্জেন্সি এক্সিটে আটকা পরে আছি এটা তো ওরা ধারণাও করতে পারবে না। হঠাৎ আমার কি মনে হলো, আমি বিরতিহীনভাবে দরজা ধাক্কাতে লাগলাম। আমাকে যে করেই হোক এখান থেকে বের হতে হবে। এভাবে কিছুক্ষণ ধাক্কাতে ধাক্কাতে দরজার ও পাশে কিছু মানুষের শোরগোল শুনতে পেলাম এবং একটু পরেই ওপাশ থেকে দরজা খুলে দিলো হোটেলের এক স্টাফ। এই ইমার্জেন্সি এক্সিটের পাশেই লিফট, একটু আগে এক ফরাসি ভদ্রলোক তার রুমে ফিরছিলেন। হঠাৎ তিনি দরজা ধাক্কানোর শব্দে বুঝতে পারেন ভেতরে কেউ আটকা পড়েছে তখন তিনি স্টাফদের ডেকে দরজা খোলার ব্যবস্থা করেন এবং হোটেলের ইমার্জেন্সি এক্সিট কেন বন্ধ ছিল সেটা নিয়ে তিনি পরবর্তীতে লিখিত অভিযোগও করেন। যদিও আমি তখন এসবের কোনো কিছুতেই মাথা ঘামাবার অবস্থাতে নেই। আমি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবো ওই ভদ্রলোকের কাছে। হোটেলের স্টাফ আমাকে লবিতে বসিয়ে একটা ঠান্ডা জুস

দিয়ে রুমের আরেকটা চাবি আনতে গেলো রিসেপশনে। তবে তার আর দরকার হলো না। আমার ফিরতে দেরি দেখে ইফতি আমাকে ফোন করে বুঝতে পারে আমি ফোন এবং চাবি না নিয়েই বের হয়ে গিয়েছি। ও সাথে সাথে নিচে নেমে আমাকে খুঁজতে থাকে, আমার বন্ধুর সাথে কথা বলে জানতে পারে আমি অনেকক্ষণ আগেই তার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছি। ইফতি বুঝতে পেরেছিলো আমি কোনো বিপদে পড়েছি। তাই ও হোটেল ম্যানেজারের সাথে কথা বলছিলো এটা নিয়ে ঠিক তখনি আমাকে দেখতে পেয়ে ওরা সবাই দৌড়ে আসে।

আমাদের হোটেল রুমের ঘড়িতে রাত ২ টা বেজে ২৫ মিনিট। অবশেষে আমি রুমে পৌঁছলাম।

(ঘটনা ৩)

এবারের গল্পটা অন্য আরেক ট্যুরের, বেশ কিছুদিন আগের।

বর্ষাকাল শুরু হলেই আমার পাহাড়ে যেতে ইচ্ছে করে! অনেকদিন ধরেই ইচ্ছেটা মনে উঁকি দিচ্ছিলো, হঠাৎ করেই একটি সুযোগ পেয়ে গেলাম।

সোশাল মিডিয়ার কল্যাণে একটি মেডিটেশন ক্যাম্পের খোঁজ পেলাম, বান্দরবানের লামায়। ব্যাস! সাথেসাথেই দুই-তিনজন বন্ধু-বান্ধবকে ফোন করলাম ওরা যাবে কি না জানার জন্য। সবাই সংসার-কর্মজীবন নিয়ে দোটানায়, এরমধ্যে আরেকটা টান সামলে উঠতে পারবে বলে মনে হলো না। অগত্যা আর দেরি না করে একাই যাবো মনস্থির করে বুকিং দিয়ে ফেললাম। যদিও তার পরদিনই সুমন, তপু, মিমি, ওদের যাওয়া কনফার্ম করলো।

রওনা দিলাম বৃহস্পতিবার রাতে। অনেকদিন পরে বন্ধুদের সাথে দেখা, গল্পে-আড্ডায় কীভাবে রাত পার হয়ে গেলো বুঝতেই পারলাম না। পরদিন সকালে আমাদের মেডিটেশন ক্যাম্পে রিপোর্টিং আর এরপর থেকে আমরা দু'দিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম পৃথিবী থেকে। এই ক্যাম্পিং আর দশটা সাধারণ ক্যাম্পিং এর মতো না। নিয়ম-শৃঙ্খলার আধিক্য দেখে আমার তো মনে হয়েছে কোনো এক আর্মি ট্রেনিং ক্যাম্পে গিয়েছিলাম। যাহোক, ওই গল্প এখানে করতে আসিনি। মেডিটেশন ক্যাম্পের শেষদিন দুপুরের খাবার খেয়ে আমরা ঢাকার উদ্দেশে রওনা দেব এমনটাই কথা ছিল। কিন্তু সুমন বললো কাছাকাছি খুব ভালো একটা ক্যাম্প-লোকেশন আছে (জঙ্গলের মধ্যে)। আমরা যদি সবাই রাজি থাকি তাহলে ওই রাতটা আমরা নিজেদের মতন ক্যাম্পিং করে পরদিন ভোরে ঢাকায় রওনা দিবো। প্রস্তাবটা সবার কাছেই লোভনীয় হওয়ায়, আমরা চারজন সেদিন মেডিটেশন ক্যাম্প থেকে চেক আউট করে আমাদের 'সোলো' ক্যাম্পিং এর উদ্দেশে যাত্রা করি। লোকেশন এ পৌঁছে আমরা তো অবাক! সুমন যা বলেছিলো তার চাইতেও সুন্দর জায়গা এটা। জঙ্গলটা খুব বেশি ঘন না, বরং সামনে কিছুটা খোলা মাঠের মতনও আছে। সুমন আর তপু

মেডিটেশন ক্যাম্প থেকে দুটো টেন্ট নিয়ে এসেছিলো। সেগুলো সেট করতে করতেই বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে নেমে এলো। সেই স্কুল লাইফে স্কাউটিং এর সময় টেন্টে থাকার ট্রেনিং নিয়েছিলাম। আমাদের কাছে প্রয়োজনীয় প্রায় সবকিছুই ছিল তাই খুব একটা টেনশন হচ্ছিলো না। সেদিন আকাশ পরিষ্কার থাকায় পূর্ণিমা না হলেও একদম ঘুটঘুটে অন্ধকার ছিলো না চারপাশ। আমরা আগুন জ্বালিয়ে রাখলাম টেন্টের সামনে। এরপর সেখানে বসে কিছুক্ষণ আড্ডা চললো। তারপরে প্রায় ঘণ্টাখানেক আমি টেন্টের ভেতরে ছিলাম, চুপচাপ, একা একা। প্রকৃতির নিস্তব্ধতা আর ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক উপভোগ করছিলাম। এমন সময় তপু ডাকলো- কিরে খাবার দাবার কিছু দে, খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে।

ক্যাম্প থেকে আসার সময় ফ্লাস্কে করে গরম পানি এনেছিলাম, সাথে আছে ইনস্ট্যান্ট নুডলস, বিস্কুট, কেক আর খাবার পানি। কিন্তু না, এতগুলো আইটেমেও সুমনের হবে না। ওর আমিষ খেতেই হবে। আসার সময় কাছেই একটা ঝিরি দেখেছিলাম, সুমন বললো- চল দেখি ওখানে চিংড়ি পাওয়া যায় কি না। নুডলস এর সাথে চিংড়ি না খেলে হয়!

সুমন আর মিমি গেলো চিংড়ি ধরতে, আমি আর তপু খাবার সাজাতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে ওরা সত্যিই কিছু কুচো চিংড়ি নিয়ে ফিরে আসলো। মিমি সেগুলি খাবার যোগ্য করলো, ফ্লাস্কের পানি কিছুটা ঠান্ডা হয়ে যাওয়ায় সেটা আবার আগুনের আঁচে গরম করে নিলাম, চিংড়িগুলোও নুডলস এর মসলায় মেখে একটু ঝলসে নিয়ে নুডলস এর সাথে মিলিয়ে নিলাম। সত্যিই খেতে দারুণ হয়েছিল! পরদিন ভোরে আমরা কথা মতন ক্যাম্পের টেন্টগুলো ফিরিয়ে দিয়ে ঢাকা রওনা দিলাম এবং ঠিকঠাক মতো পৌঁছলাম। ঘটনা শুরু হলো এরপরে।

ঢাকায় পৌঁছে ফ্রেশ হয়ে একটা ঘুম দিলাম, ঘুমের মাঝেই দেখলাম সুমন কল করেছে। রিসিভ করতেই বললো,
- তোর কি কোনো সমস্যা হয়েছে?
- ধুর ব্যাটা! সমস্যা আবার কী! তুই ফোন রাখ, আমি ঘুম থেকে উঠে তোকে কল করবো।
- মিমি অলরেডি হাসপাতালে। তপুর জ্বর, আমারও শ্বাসকষ্ট এবং অসহ্য চুলকানি হচ্ছে।
- বলিস কী, কেন!

বলে উঠতে যাবো, মনে হলো ঠান্ডা লেগে আমার মাথা ভারী হয়ে আছে এবং গায়ে জ্বর। ওদেরকে মিমি যে হাসপাতালে ভর্তি সেখানে আসতে বলে আমিও কোনোমতে রেডি হয়ে বের হলাম।

আমরা চারজনই একই ডাক্তারের পরামর্শ নিলাম। ভাবলাম পাহাড়ি কোনো পোকা-মাকড়ের কামড়ে এমন হয়েছে। ডাক্তারকে সব কিছু খুলে বলার পর তিনি কিছু টেস্ট করতে দিলেন। টেস্ট রিপোর্টে আমাদের সবার Total IgE level (Immunoglobulin E, যার মাধ্যমে রক্তে এলার্জির মাত্রা নির্ধারণ করা হয়) 600

(IU/ml) এর অধিক পাওয়া গেলো। ডাক্তার ধারণা করছিলেন আমরা যে চিংড়ি মাছ খেয়েছিলাম সেটাই আমাদের এই ক্ষতির কারণ ছিল। যাহোক, আমাদের চিকিৎসা শুরু হলো। তবে এটা এমন কোনো অসুখ না যে কিছুদিন ওষুধ খেলেই সেরে যাবে। সিজোনাল অসুখ হিসেবে প্রায়ই এটা ফিরে আসে, আর আমাদেরকে সেই ক্যাম্পের কথা মনে করিয়ে দেয়।

ও.আর.এস.

ডা. মো. দিদারুল করিম
মেডিক্যাল অফিসার
অবনী ফ্যাশন্স লিমিটেড

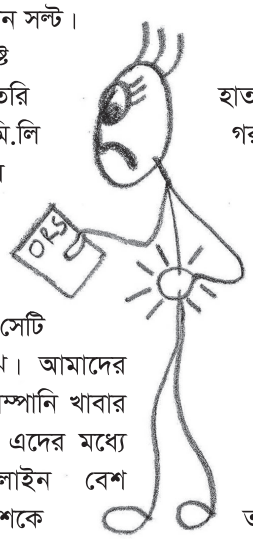

ও.আর.এস-ওরাল রিহাইড্রেশন সল্ট। এটি ১০.২৫ গ্রাম ওজন বিশিষ্ট তিনটি উপকরণের সমন্বয়ে তৈরি এক প্যাকেট লবণ, যা ৫০০মি.লি বিশুদ্ধ পানির সংমিশ্রণে খাবার স্যালাইন হিসেবে তৈরি হয়। আমাদের দেশে প্রতিটি ঋতুতে ব্যাপক জনপ্রিয় এই মুখে খাবার স্যালাইন। হোক সেটি জেনে বুঝে অথবা না বুঝে। আমাদের দেশে অনেকগুলো ঔষধ কোম্পানি খাবার স্যালাইন বাজারজাত করে। এদের মধ্যে এসএমসি'র খাবার স্যালাইন বেশ জনপ্রিয় ও কার্যকর। নব্বই দশকে বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত বিজ্ঞাপন "ফরিদ ভাই তোমার দোকানে কি খাবার স্যালাইন আছে" এই শিরোনামের এসএমসি'র খাবার স্যালাইনের বিজ্ঞাপনটি বেশ সাড়া ফেলেছিলো। আমাদের ফ্যাক্টরিস্থ মেডিকেল সেন্টারে রোগীরা বিভিন্ন উপসর্গ নিয়ে হাজির হলেও তাদের চাহিদার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে এই খাবার স্যালাইন। রোগীদের ভাষ্য অনুযায়ী উপসর্গগুলোর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে- ঘাড় ব্যথা, পেট ব্যথা, মাথা ব্যথা, মাথা ঘুরানো, বমি, বমির ভাব, সকালে না খেয়ে আসা, পেট নামা, পেট নরম হওয়া, বারবার ওয়াশরুমে যাওয়া, পাতলা পায়খানা, ডায়রিয়া, ডাইরেক্ট হয়ে যাওয়া, হাত পা কালাইয়া যাওয়া, হাত পা সরসরানো, শরীর দুর্বল লাগা, গরম লাগা, ভালো না লাগা, মনে হয় প্রেসার কমে গেছে, ইত্যাদি। চাহিদার কেন্দ্রবিন্দুতে কিন্তু এক প্যাকেট খাবার স্যালাইন! এক প্যাকেট খাবার স্যালাইন যেন এক প্যাকেট প্রাণ (জীবন)। খাবার স্যালাইন মূলত প্রচুর বমি, অনেকবার পাতলা পায়খানা বা গরমের ফলে শরীর থেকে পানি বের হয়ে যায় সেই লবণ, তা পূরণ করার জন্য পান করা হয়। উচ্চ রক্তচাপের রোগিকে খাবার স্যালাইন দেওয়া যাবে না। কারণ স্যালাইনে থাকা সোডিয়াম ক্লোরাইড রক্তচাপ বাড়ায়। তাহলে এদের পাতলা পায়খানা বা অতিরিক্ত বমি হলে ঔষধের পাশাপাশি কোন স্যালাইন খাওয়াতে হবে? এসব রোগীদের জন্য রাইস স্যালাইন খেতে দিতে হবে। ৫০০মি.লি. পানি গরম করে এতে এক প্যাকেট রাইস স্যালাইন ঢেলে দিয়ে নাড়তে হবে। সুজির মতো আঠালো একটি দ্রবণ তৈরি হবে। এটি খেতে হবে। এই দ্রবণের কার্যকারিতা থাকবে ৫ ঘণ্টা। ৫ ঘণ্টা পর প্রয়োজন হলে আবার নতুন করে এ দ্রবণ তৈরি করতে হবে। অপর

দিকে খাবার স্যালাইন তৈরির নিয়ম হচ্ছে ৫০০মি.লি. বিশুদ্ধ পানিতে এক প্যাকেট স্যালাইন ঢেলে দিয়ে পরিষ্কার একটি চামচ দিয়ে নাড়তে হবে। এটির কার্যকারিতা থাকবে ১২ ঘণ্টা। ১২ ঘণ্টার পর প্রয়োজন অনুযায়ী আবার তৈরি করতে হবে খাবার স্যালাইন। যেখানে স্যালাইনের প্যাকেট নেই সেখানে কী করণীয়? হাত সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে ধুয়ে এক মুঠো গুড় বা চিনি, ৫০০মি.লি. বিশুদ্ধ পানি, তিন আঙ্গুলের মাথার এক চিমটি লবণের সংমিশ্রণে সহজেই ঘরে বসেই তৈরি করা যায় খাবার স্যালাইন। যার গুণগত মান প্যাকেটের স্যালাইনের মতোই।

যারা বেশি উপকারিতার জন্য এক গ্লাস অনেকেই আছেন পানিতে এক প্যাকেট স্যালাইন গুলিয়ে পান করেন। এতে হিতে বিপরীত হয়। অল্প পানিতে স্যালাইন গোলানোর কারণে বেশি ঘনত্বের লবণ শরীরের ভেতরে গিয়ে লবণের পরিমান বাড়িয়ে দেয়। ফলে শুরু হয় খিঁচুনি যা খুবই মারাত্মক। এ থেকে কিডনি নষ্ট হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। সুতরাং একটি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনেই স্যালাইন গোলাতে হবে। ছোট বড় সবার জন্য একই নিয়ম। তবে তা অবশ্যই একজন রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের নির্দেশ মতো প্রয়োজন অনুযায়ী পান করতে হবে।

পথের বাঁকে

মো. শাহজালাল মিয়া পলাশ
এজিএম, ইনফরমেশন টেকনোলজি
ব্যাবিলন গ্রুপ

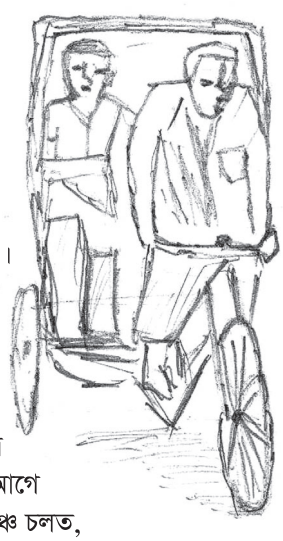

হানিফ সাহেব যখন দুর্গাপুর বাজারে নামলেন তখন প্রায় বিকেল পাঁচটা। সদরঘাট টার্মিনাল থেকে সকাল সাতটায় তিনি লঞ্চে উঠেছিলেন। ধনাগদা নদীর তীর ঘেঁষেই দুর্গাপুর বাজার। দুর্গাপুর বাজার থেকে ঢাকা আসা যাওয়ার একমাত্র বাহন হল এই লঞ্চ। আগে সারাদিন মাত্র দুইটা লঞ্চ চলত, একটা সকালে আরেকটা বিকেলে। এখন প্রায় এক ঘণ্টা পর পরই লঞ্চ আসা যাওয়া করে। বাজারের পশ্চিম পাশে একটু হেঁটে গেলেই রিকশা স্ট্যান্ড। সেখান থেকে একটা রিকশা ভাড়া করে তাতে চেপে বসলেন তিনি, গন্তব্য সুজাতপুর গ্রাম, হানিফ সাহেবের গ্রামের বাড়ি।

দুই পাশে কলাবাগান আর মাঝখান দিয়ে সরু আঁকাবাঁকা কাঁচা রাস্তা চলে গেছে গ্রামের ভেতর দিয়ে। রিকশার টুংটাং শব্দ আর পড়ন্ত বিকেলের আলো চারপাশে এক অদ্ভুত সোনালি পরিবেশের সৃষ্টি করেছে।

- স্যার কি তালুকদার বাড়ি যাইবেন? সামনে থেকে এই প্রথম কথা বলল রিকশা চালক।
- হ্যাঁ, ওই যে বাজারের পেছনের বাড়িটা, চেনেন তো?
- আপনের বাবার নাম লতিফ তালুকদার না?
- হ্যাঁ!

এবার ভালো করে রিকশাচালকের দিকে তাকালেন হানিফ সাহেব, বয়স পঞ্চাশের মতো হবে, গায়ের রঙ কালো, জীর্ণ শরীর, গায়ে একটা পুরোনো শার্ট আর পরনে লুঙ্গি। সারা শরীর ঘামে ভেজা আর পায়ে কর্দমাক্ত একজোড়া জুতা।

আজ প্রায় দীর্ঘ সতের বছর পর গ্রামের বাড়ি যাচ্ছেন হানিফ সাহেব। গত সাতাশ বছরে এই নিয়ে মাত্র তিনবার বাড়ি আসা। আসবেনই বা কীভাবে, প্রতি পাঁচ-ছয় বছর পরপর কানাডা থেকে বাংলাদেশে আসেন, তাও মাত্র এক সপ্তাহের জন্য। এই এক সপ্তাহে কত শত কাজ করতে হয় তার ইয়ত্তা নেই। কানাডার অটোয়াতে ফ্যামিলি নিয়ে তিনি সেটলড। একমাত্র ছেলেটা

গ্রেড-১২ এর স্টুডেন্ট। ছোটোবেলা বাংলাদেশে একবার এসেছিলো, দুইদিন থেকে চলে গিয়েছিলো। বাংলাদেশ তার ভালো লাগে না! ভাবতেই মনটা খারাপ হয়ে যায় হানিফ সাহেবের।

- স্যার তো বাড়িত আসেন না? বাড়ির কথা মনে পড়ে না বুঝি? গেরামের বাড়ি হইল আমগো মায়ের মতো, মারে কি বুইল্লা থাকন যায়? লতিফ চাচা মরণের আগে খালি আপনের কথা কইতো, সারাদিন লঞ্চ ঘাটে গিয়া বইসা থাকতো। যারে পাইতো হেরেই কইতো আজ আমগো হারু আসবো!

স্মৃতির আঙিনা থেকে হঠাৎই বাবার মুখটা ভেসে উঠলো। বাবার হাত ধরে কত শত বার এই রাস্তা ধরে দুর্গাপুর বাজারে এসেছে তার কোনো হিসাব নেই। ফেরার পথে গণেশ বাবুর দোকান থেকে মুরুলি কিনে দিতে বাবা কখনোই ভুলতেন না। মা মারা যাওয়ার দুই বছরের মাথায় বাবা মারা গেলেন। মৃত্যুপথযাত্রী মাকে যদিও শেষবারের মতো একবার দেখেছিলেন কিন্তু বাবাকে সে দেখাও দেখতে পাননি।

- তুমি ব্যাপারী বাড়ির জাহাঙ্গীর না?
- জি।
- তুমি আমাকে চিনতে পেরেছো?
- হ, চিনতে পারছি।
- তাহলে প্রথমে বলোনি কেন?
- আগে বললে আপনি আমার রিকশায় উঠতেন না, গলায় থাকা গামছা দিয়ে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে উত্তর দেয় জাহাঙ্গীর। আপনারা সাহেব মানুষ বিদেশে বড় কাজ করেন আমরা দেশে রিকশা চালাইয়া খাই।
- জাহাঙ্গীর, বিয়ে-শাদি করেছো না?
- কী যে কন না! বড় মাইয়ারে বিয়া দিছি আইজকা আট বছর, সেই ঘরে আল্লাহর রহমতে একটা মাইয়া হইছে।
- তোমার ছেলে-মেয়ে কয়জন?
- জি, আল্লাহপাক পাঁচজন পোলাপাইন দিছেন - দুই ছেলে তিন মেয়ে। দুই মাইয়ার বিয়ে দিয়ে দিছি, শ্বশুড়বাড়ি থাকে। দুই ছেলের একজন আমার লগে রিকশা চালায় আরেকজন টেইলারি কাম শিখে।
- তোমার ছেলে মেয়েরা কেউই পড়াশোনা করেনি?
- ছোটবেলা থেকেই পড়ে নাই এখন বড় হইয়া আর কী পড়বো!

ছোটবেলায় হানিফ সাহেব আর জাহাঙ্গীর ছুটি হলে একসাথে দৌড়ে বাড়ি যেত। ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত তারা একই ক্লাসে পড়তো। তালুকদার বাড়ির ঠিক দুই বাড়ির পেছনে ব্যাপারী বাড়ি। এই জাহাঙ্গীরের সাথে কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে! একসাথে মাঠে খেলা, পুকুরে মাছ ধরতে নামা, ক্ষেত থেকে টমেটো চুরি করে খাওয়া। ছোটবেলায় তাদের মধ্যে অনেকবার মারামারিও হয়েছে। হানিফ সাহেব জাহাঙ্গীর আলমের সাথে মারামারি করতো আবার খানিক বাদেই মিলে যেত ঠিক যেন একই বৃন্তে ফোটা দুটি ফুল। কত অদ্ভুত ঘটনা ঘটে মানুষের জীবনে। ছোটবেলায় একসাথে চলা দুই বন্ধুর একজন এ গ্রামেই রিকশা চালিয়ে কোনভাবে জীবন যুদ্ধে টিকে আছে, যেখানে আরেকজন হাজার

মাইল দূরের কোন এক দেশে মস্ত বড় বাড়ি আর কোটি টাকা দামের গাড়িতে জীবন কাটাচ্ছে। অথচ ছোটবেলায় এই জাহাঙ্গীরদেরই ছিলো অনেক সম্পত্তি আর ভোগবিলাস।

সময় অনেক বিচিত্র আর অদ্ভুত হয়ে ধরা দেয় মানুষের জীবনে!

- তুমিতো ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত আমার সাথে পড়েছো, পরে আর পড়াশোনা করোনি কেন?
- একবছর পড়ছিলাম। ক্লাস সেভেনে ওঠার পরে হঠাৎ কইরা বাবা মইরা গেল, সংসারের হাল ধরতে হইল, পরে আর পড়াশোনা করতে পারলাম না।

সুজাতপুর আইসা পরছি! রিকশাচালক জাহাঙ্গীরের কথায় হঠাৎ যেন হানিফ সাহেবের ঘোর ভাঙলো। সত্যি তো চলে এসেছে সুজাতপুর বাজার! কেমন যেন চেনা-অচেনা এক মিশ্রণে ভরে আছে বাজারটি, আগের থেকে অনেক বড় হয়েছে অনেক নতুন নতুন দোকানপাট হয়েছে।

বাজারের পরেই তালুকদার বাড়ি। সূর্য ইতিমধ্যেই অস্ত গিয়েছে। রাস্তার শেষমাথায় তালুকদার বাড়ির গেটের উপরে নামফলকটি ঝাপসা মতো বোঝা যাচ্ছে। গেটের সামনে রিকশা থামতেই, হাতের ব্যাগটি নিয়ে রিকশা থেকে নামলেন হানিফ সাহেব। পকেট থেকে ৫০০ টাকার একটি নোট বের করে জাহাঙ্গীরকে দিলেন।

- ভাড়া তো ৫০ টাকা, ৫০০ টাকা দিলেন কেন? আমার কাছে এত টাকা ভাংতি নাই!
- ভাংতি লাগবে না, বাকি টাকাটা দিয়ে তুমি বাসার জন্য কিছু মিষ্টি আর মুরালি কিনে নিয়ে যেও।

হানিফ সাহেবের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে, টাকাটা হাতে নিয়ে লুঙ্গির ভাঁজে রেখে রিকশাটা ঘুরিয়ে চলে যেতে লাগল জাহাঙ্গীর। যেতে যেতে অনেক দূরে চলে গিয়েছে জাহাঙ্গীর। তাকে আর দেখা যায় না। রিকশাটা প্রায় অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। গেটের সামনে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছেন হানিফ সাহেব। সেদিকে তাকিয়ে মনের ভেতরে কোত্থেকে যেন এক শূন্যতা অনুভব করলেন জাহাঙ্গীর এর জন্য। হয়তো এ জীবনে আর কখনো দেখা হবে না তার সাথে। মাথা উঁচিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন হানিফ সাহেব। ডুবে যাওয়া সূর্যের রক্তিম অংশটুকু ছড়িয়ে আছে বিস্তীর্ণ আকাশ জুড়ে। মসজিদের মাইকে মাগরিবের আজানের সুর ভেসে এলো ...

তবে এ কেমন ভালোবাসা!

মো. ফরহাদ হোসেন নির্জন
সিনিয়র মার্চেন্ডাইজার, মার্কেটিং অ্যান্ড মার্চেন্ডাইজিং
ব্যাবিলন গ্রুপ

কেন থেমে যাবে আমার উন্মাদনা?
নীরবে নিভৃতে কেঁদে যাবে আমার মন?
কেন সীমা অতিক্রম করবে না আমার স্বপ্নগুলো?
তবে এ কেমন ভালোবাসা?

যে ভালোবাসার বর্ণমালায় মিশে থাকবে না
আমার নাম,
থাকবে না সুর-সঙ্গীতে আমার অস্তিত্ব,
কিংবা আঁকা হবে না শিল্পীর রং তুলিতে আমার ছবি,
তবে এ কেমন ভালোবাসা?

কেন রোদেলা দুপুরে খরতাপে পুড়বে আমার হৃদয়?
কেন বৃষ্টির প্রথম পরশ বিন্দু বিন্দু করে ছুঁয়ে যাবে না আমায়?
কেন গোধূলি বিকেলে বইবে না বসন্ত বাতাস,
অন্ধকারে আলো দেবে না জোনাকি?
কেন হবে না ভোর, ফুটবে না শিউলি?
তবে এ কেমন ভালোবাসা?

কেন শান্ত সমুদ্রের বুকে আজ অশান্ত ঝড়?
পাহাড়ের আর্ত চিৎকারে কাঁদছে ঝরনা,
কেন আমার হৃদয়ের উত্তাল ঢেউয়ে
ভেসে যাবে না সব কষ্ট?
কেন বাস্তবতার মাঝে বিলীন হয়ে যাবে আমার কল্পনা?
কেন থাকবে না- পাওয়া না পাওয়ার মাঝে কোন অভিমান?
তবে কি সব মিথ্যের মাঝে
হারিয়ে যাবে আমার সত্যটা?

ইংরেজি

রাকিব হাসান
কোয়ালিটি ইন্সপেক্টর, কোয়ালিটি
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

ইংরেজি আর পড়ব না মা
বই দেবো সব ফেলে
আমিতো নই খাস বিলেতি
মেম সাহেবের ছেলে।

মোদের বাড়ির পুষিকে মা
বিড়াল বলে জানি,
আজকে তাকে কেমন করে
ক্যাট বলে মা মানি।

ছাটুর কুটুর দুষ্ট ইঁদুর
ইংরেজিতে র‍্যাট,
মোটা দেখে বাবাকে আজ
বলব কি মা ফ্যাট?

হিজিবিজি এই ইংরেজি
কিছু ভালো লাগে না,
মাদার রেখে মাতৃভাষায়
ডাকবো তোমায় মা।

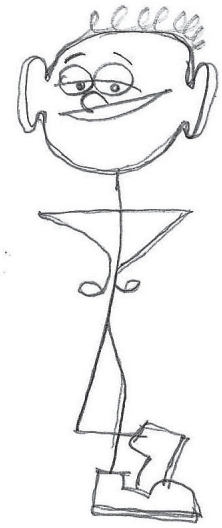

ভূমণ্ডলের কথকতা

মানিক বনিক
সিকিউরিটি গার্ড, অ্যাডমিন
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

জীবন সত্য মৃত্যু সত্য দুটোই বহমান,
তোমার আমার জীবন কাহিনী চালায় রহমান।
এমন একটি সূত্রে বেঁধে করছেন তিনি খেলা,
ভেবে কি আর সময় পাবে কেটে গেলে বেলা!

কী করিলে বুঝবো তবো আছে যত লীলা,
কোরআন, পুরাণ, গীতা, বাইবেল কত কিছু দিলা।
এসব বুঝে যে করিবে তাহার আচরণ,
তাহার মাঝে উঠবে ফুটে লীলার বিবরণ।

স্রষ্টা তোমার দেহের ভিতর আছে কোন কোণে,
কত দেশের কত জ্ঞানী কতই ফুলঝুঁড়ি বুনে।
যখন আমরা বুঝবো আসল নকলটাকে ভুলে,
তখন মোরা ভূ-মণ্ডলের ঠেকবো নতুন কূলে।

মানুষ নামের মুখোশ নিয়ে আছি যারা বেঁচে,
দুনিয়াতে কত জ্ঞানী, ভাবুক হয়ে দেখলো তাহা সেঁচে।
পরিশেষে যাহা হবে স্রষ্টার অভিলাষ,
চিরদিনই মু'মিনগণের তাহাই স্বেচ্ছাদাস।

গোল্ড কয়েন

উম্মে সালমা ডালিয়া
অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার, প্যাটার্ন
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

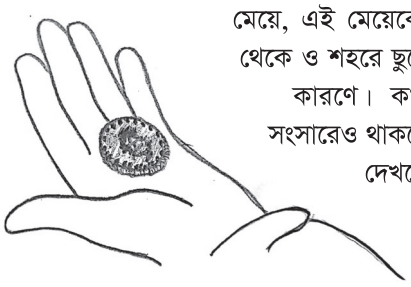

উপমহাদেশ কে শাসন করছিল তখন। সালটা মনে নেই আমার। অসংখ্য হাত ঘুরে ঘুরে আমি চলে এসেছিলাম এই ভারতীয় উপমহাদেশে। ওহ্ দুঃখিত, আমি এখনও আমার পরিচয়টাই দেইনি। আমি একটি সোনার কয়েন। বার বার হাত বদল হতে হতে এসে পড়লাম এক বাঙালি ভদ্রলোকের হাতে। এই ভদ্রলোকের কাছে ছিলাম বেশ কয়েক বছর। সেই লোকের জীবনটা ছিল বেশ কষ্টের, প্রথম পক্ষের স্ত্রী মারা গেলে উনি আবার বিয়ে করেন কিন্তু এই স্ত্রীও বেশিদিন উনাকে সঙ্গ দিতে পারেনি; বেশ কয়েকটি বাচ্চা উপহার দিয়ে তিনিও পৃথিবী থেকে চির বিদায় নেন। এর জন্য ভদ্রলোক পড়ে যান ভীষণ বিপদে। যাহোক, উনি আর কোনো বিয়ে না করে সন্তানদেরকে নিজেই লালন পালন করেন। প্রথম পক্ষ এবং দ্বিতীয় পক্ষ মিলিয়ে অনেকগুলো সন্তানের দেখাশুনা করা, তাদেরকে লেখাপড়া করানো এবং ভরণপোষণ একাই করতে লাগলেন তিনি। সাধ্যমতো চেষ্টা করে সে মেয়েদের সুপাত্র দেখে বিয়ে দেন, ছেলেরাও সবাই বিয়ে থা করে সংসারী হয়। বাকি ছিল শুধু ছোট মেয়ে, এই মেয়েকে নিয়ে তিনি এ শহর থেকে ও শহরে ছুটে বেড়িয়েছেন কাজের কারণে। কখনও তার ছেলেদের সংসারেও থাকতে হয়েছে মেয়েটাকে। দেখতে দেখতে মেয়েটি বড় হয়ে যাচ্ছিল, মেয়েকে বিয়ে দিতে হবে, তাই তিনি তার নিজ জেলায় ফিরে আসেন। একদিন তার মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। বিয়েতে মেয়ের জামাইকে একটা কিছু দিতে হবে। তখনি তার আমার কথা মনে পড়ে গেল। উনি আমাকে নিয়ে গেলেন স্বর্ণকারের দোকানে। এই প্রথম আমি আমার নিজের নাম ও আকৃতি হারালাম। স্বর্ণকার আমাকে গলিয়ে আংটি বানিয়ে দিলো। আমার বর্তমান মালিকের মেয়ের জামাইয়ের জন্য। আমি এখন আংটি হয়ে তার মেয়ের জামাইয়ের হাতে শোভা পাচ্ছি। কিছুদিন ব্যবহারের পর আমার বর্তমান মালিক আমাকে একটি কৌটায় বন্ধ করে রেখে দেন। এর মাঝে ওই ভদ্রলোকের সংসারে দেখতে দেখতে অনেকগুলি সন্তানের জন্ম হলো এবং সেই সাথে শুরু হলো সংসারের টানাটানি। এক জনের আয়ে এতো বড় সংসারের ব্যয় বহন করতে ভদ্রলোক হিমসিম খেতে লাগলেন। একে একে অনেকগুলো ছেলের পরে ঘরে এলো এক

কন্যা সন্তান। সবার আনন্দ আর ধরে না। বাবা, মা আর ভাইদের আদরে আহ্লাদে মেয়েটা একটু একটু করে বড় হতে লাগলো। এদিকে মেয়ের মায়ের ইচ্ছে হলো মেয়ের কান ফুটো করানোর। তাই এক জোড়া সোনার রিং প্রয়োজন। কিন্তু অভাবের সংসারে যেখানে নুন আনতে পান্তা ফুরায় সেখানে কীভাবে সোনার রিং বানানো হবে! তখনি গৃহকর্তার মনে হলো আমার কথা। উনি এবার আমাকে ভেঙ্গে কানের রিং বানাতে দিলেন। আবার আমার নাম ও আকৃতি বদল হলো। এবার আমি কানের রিং হলাম। প্রথম মেয়ে জন্মানোতে পরিবারের সবাই খুব খুশি হয়েছিল তাই মেয়ের কান ফোড়ানো উপলক্ষে পাড়ার মহিলাদের নিয়ে একটি ছোট খাটো অনুষ্ঠান করা হলো। বাচ্চা মেয়েটার কানের ছিদ্র পুরোপুরি শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে অবশেষে আমাকে পরানো হলো। কিন্তু ছোট বাচ্চার কানের লতির তুলনায় আমার ওজনটা একটু বেশি হওয়ায় আবার আমাকে খুলে রাখা হলো। এর কিছুদিন পর উনার স্ত্রীর কানের দুল জোড়া সংসারের প্রয়োজনে ত্যাগ করে দিতে হয় এবং উনি আমাকেই কানে পরে নেন। এভাবে উনার কানে আমি ছিলাম অনেক দিন। আমার যিনি মালিক ছিলেন, তার স্ত্রী ছিলেন অনেক ভালো মনের মানুষ। তখনকার দিনে পরিচিত লোকেরা একে অন্যের জিনিস চেয়ে নিয়ে পরত। তাই অনুষ্ঠানে পরবে বলে পাশের বাড়ির একটি মেয়ে উনার রিং জোড়া চাইলো। সব ঠিকই ছিল কিন্তু গোল বাধলো রিং জোড়া ফেরত আনার সময়। যে মেয়েটি রিং জোড়া নিয়েছিল ও আর ফেরত দিচ্ছে না দেখে উনি উনার মেয়েকে পাঠালেন ওটা ফেরত আনতে। বাচ্চা মেয়েটি ঠিক মতোই রিং জোড়া ফেরত আনলো, কিন্তু ফেরার সময় ওর তুলনায় বেশ বড় একটা ড্রেন পার হবার সময় হাত থেকে রিং জোড়া পড়ে গেল ড্রেনে। বাচ্চাটা ভয়ে কান্না করতে লাগলো, কারণ বাসায় গেলে নির্ঘাত মার খেতে হবে। ওর কান্না দেখে অনেকগুলো বাচ্চা এগিয়ে এলো। এদের মধ্যে থেকে একজন যেয়ে ওর ভাইকে খবর দিলে এক ভাই ছুটে এসে ওকে কোলে নিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগলো যে এটা পাওয়া যাবে। যদিও মুখে বলছিল পাওয়া যাবে কিন্তু সন্দেহ হচ্ছিল, না পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ যেখানে আমি পড়েছি সেটা ড্রেনের শেষ মাথা, এর পরই ডোবা। ড্রেনের পানি সারাক্ষণ চলমান তাই বলা মুশকিল কতক্ষণ আমি এখানে থাকতে পারবো। আমাকে খোঁজার জন্য বড় কোদাল আনা হলো। সমানে ড্রেনের ময়লা তোলা হচ্ছে, কিন্তু আমার নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না। বেশ অনেকবার চেষ্টার পর অবশেষে আমাকে পাওয়া গেল। সবাই খুব খুশি হয়েছিল। অনেকেই বলছিল নিশ্চয় যাকাত দেওয়া সোনা তাই সেটা ফেরত পাওয়া গেল। এর পর দীর্ঘদিন যাবৎ আমি এদের মেয়ের কাছেই ছিলাম। আমার বর্তমান মালিক ভদ্রলোকের মেয়ে। তিনি মাঝে মাঝে আমাকে পরতেন। মাঝেমধ্যে আলমারি খুলে আমাকে ছুঁয়ে দেখত। কারণ অনেক বছর আগেই সে তার বাবা মাকে হারিয়ে ফেলেছে। তাই আমার মাঝে সে তার বাবা মায়ের ভালোবাসা খুঁজে পেত।

St. Martin's Island Revisited

Arif Bhuiyan
Group CEO
Babylon Group

On a February afternoon in 1992, I was sitting under the shade of coconut trees that had created the shore on the western side of Cox's Bazar sea beach, casually sipping from a chilled drink. While my eyes were gazing at a group of fellow travelers playing football in the backdrop of cloudy water and shallow waves of winter in the Bay of Bengal, my ears were focused on a nearby chit chat that my friends were having in that leisurely afternoon. They were planning to stay back in Cox's Bazar for a couple of days more instead of going back to Dhaka with their colleagues that night.

My mind at that time took me to another afternoon few days earlier in a canteen of Dhaka University. A friend of us who had returned that morning from a trip to St. Martin's island, were illustrating his experiences there. All of our eyes were glued on his rusty unslept

looking face, listening to his vivid description of the paradise island. It was not a long time ago that we had read the book “Daruchini Dwip” written by Humayun Ahmed.

That February afternoon in Cox’s Bazar, while gazing at a football game, I started fantasizing myself as a character of “Daruchini Dwip” and decided that my next destination from Cox’s Bazar would be St. Martin’s island. Later that afternoon, I boarded the last bus to Teknaf hoping to spend the night at a hotel in there and find my way to the St. Martin's island in the following morning. A meal with shutki bhorta and beef followed by some small talks with the restaurant manager sitting on a bench in front of the restaurant, under a starry night in quiet Teknaf town would be more than I could expect that evening.

Next morning, as the distance from Teknaf was widening, the green line of trees in the distant south were becoming clear and as our boat was approaching the delta, I could barely hide my excitement of being on the sea….my first experience of the sea, smell of its salty air, sea wind, riding on the waves and my companions in the air…few seagulls were flying along the boat, squawking. Sitting in the hull, I was even enjoying the up and down rhythm of the waves. My excitement must have some animated expressions on my face…soon my fellow riders started conversing with me. Their curiosity about me and acceptance of me as a stranger, made me feel welcomed not only on that boat but also on the island. They were largely inhabitants of St. Martin's island. Some of them were going back home in the island while others were going away from home…all with a purpose of trade. I guess in those days one could hardly see a visitor on those boats plying between St. Martin's island and Teknaf. Usually a couple of boats used to ply between two shores in a day. I was the only visitor in the island that afternoon. The St. Martin’s island welcomed me with its crystal-clear water,

wooden jetty, lined up coconut trees surrounding the island, curious eyes of men and children of different age. Local women mostly remained inside their houses. I jumped into the knee-deep water in order to get off the boat since the platform of the jetty was higher than the boat. I liked the feel of the cool and clean water on my legs, the feel of the fine gravels of the sea bed under my feet.

No other strangers were to be seen in the island for the next two days of my stay. I stayed at a two-bedroom cyclone shelter. In those days this was the only concrete structure in the island apart from a Bangladesh Border Guard Center. My first evening in the island was occupied by a dinner with fish curry and rice at the tea stall, conversations with a student of a local madrasa and a boat owner, and above all, a boat ride at night in waters of St. Martin's island. The night sky was starry and phosphorous was glowing in the waters around the helm of the boat as it was moving across in the dark. Later that night I was lying on the jetty near the end of it, staring at the sky when the stillness of the night was shattered by a shout of a man to his fellow boatmen. I did not notice the men approaching near me earlier. While he was waiting for his people to reach the jetty with a boat, he told me seamen's stories on the moon and stars, and showed me the stars that provide them directions to reach places in the coasts of Bengal from the sea.

Twenty-nine years later, a large cruise ship anchored in the waters of St. Martin's island on a mid-December morning with nearly two thousand people on board. It took hours for the passengers to disembark the ship onto a barge with final landing on a broken, crowded jetty. We were welcomed with the buzz of human activities around the jetty, continuous honking of the battery powered rickshaws and shouts of restaurant-walas offering breakfasts. While riding a rickshaw to our destination in the western side of the island, I was curiously awaiting what

was to be offered by the resort!

Idling the day walking around hundreds of people on the beach, talking with locals in a tea stall, an evening surrounding a fire and bar-be-que and the certainty of delicious meals made the most of my day.

The following day my wife and I took a small but modern ocean-worthy boat to Cox's Bazar from the island. The rickshaw ride to the jetty from the hotel was occupied with thoughts on the island in 1992 and in 2021, me wondering about what happens to the tons of waste that we create every day in the island. Where does all the sewer go? I also made lot of complaints to my wife about all the concrete structures around.

After a few months, while I'm writing my experiences on both visits, I realize that in its essence my feelings are actually the same. There are differences on the surface though islands never change, no matter what changes we bring about on its surface.

ফটো অ্যালবাম

ব্যাবিলন কথকতার ১৬ তম সংখ্যার মোড়ক উন্মোচনী উৎসবের বিশেষ ক্ষণে আমন্ত্রিত অতিথিগণ, গ্রুপ সিইও, পত্রিকার সম্পাদক এসএম এমদাদুল ইসলাম এবং প্রধান অতিথি বিশিষ্ট লেখক ও কার্টুনিস্ট জনাব আহসান হাবীব।

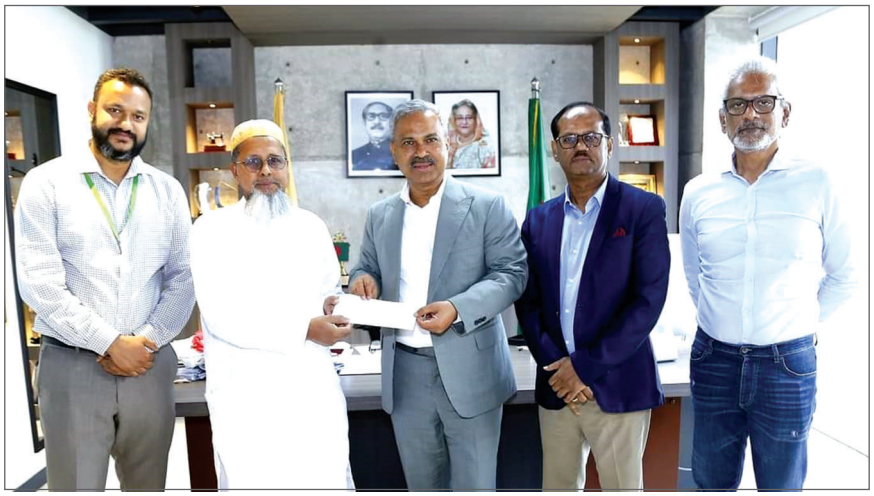

বন্যার্তদের সহযোগিতায় 'বিজিএমইএ ত্রাণ তহবিল' এ ব্যাবিলন গ্রুপ এবং এর কর্মীদের পক্ষ থেকে দশ লাখ টাকার চেক হস্তান্তরকালে ব্যাবিলনের প্রতিনিধিগণ।

বার্ষিক ব্যাবসায়িক পরিকল্পনা-২০২২ এবং দলগত দক্ষতা বৃদ্ধির অধিবেশনে ব্যাবিলনের নেতৃত্ব প্রদানকারী দলের একই ফ্রেমে বন্দি হবার বিশেষ মুহূর্ত (ডিসেম্বর, ২০২১)।

ব্যাবিলন শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্পের ৯ম ব্যাচের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের একাংশ।

‘আজকের শিশু, আগামী দিনের ভবিষ্যৎ’ -এই স্লোগানকে মাথায় রেখে ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড এর শিশু দিবা পরিচর্যা কেন্দ্রে শিশু দিবস উদযাপনের আনন্দঘন মুহূর্ত।

শীতার্ত মানুষের সহায়তায় সব সময় পাশে থাকে ব্যাবিলন। তারই ধারাবাহিকতায় সাতক্ষীরার শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন ব্যাবিলন গ্রুপের কর্মকর্তাগণ (ডিসেম্বর, ২০২১)।

NEWGEN TECHNOLOGY LTD
BABYLON RESOURCES LTD

B2B

- Sales & Channel Management System
- Merchandising Management System
- Production Management System
- Inventory Management System
- Babylon Payment Automation System (BPAS)
- LC Management System (LCM)
- Cash Incentive Management System

B2G

- Software Development
- Apps & Games Development
- Government Training

B2C

- LearnersCafe
- DAR – Daily Activity Report
- EventBy
- UNLOCK – Video Conferencing Solution

Training

- Database
- Security
- Programming
- Networking
- Digital Marketing
- Graphics Design

Games & Apps

- PROTTAYHRMS
- GPS71
- 1MinuteJobs
- CASTLE TRAPS

We became Champion in Indigenous Service Category of Basis National ICT Award for 'Learnerscafe' in 2019.

We became Champion in Supply Chain Category of Basis National ICT Award for 'Prottay ERP' in 2018.

Floor–7A, House 3/1, Block F, Lalmatia,Mohammadpur, Dhaka 1207 +88 (02) 9015165, 9015348, +8809609003306 www.brlbd.com www.newgen-bd.com

BABYLON TRIMS LIMITED

(A Concern of Babylon Group)

Our Products:

- Auto Carton Box
- Manual Carton Box
- Poly Bag
- Recycle Poly Bag
- Zip Lock Poly Bag
- Gum Tape
- Back Board
- Neck Board
- Plastic Clip
- Collar Insert
- Butterfly
- Tie Bed
- Photo Inlay
- Hang Tag
- Price Ticket
- Boxes
- Cascade
- Wrap Band
- Barcode Sticker
- Carton Sticker
- Size Sticker
- Tissue Paper
- Printed Label

Compliance Certificate

- Walmart Social Compliance
- FSC Certificate
- Oeko-Tex
- Alliance
- Wrap Certificate

Walmart
Save money. Live better.

Office & Factory :
Kandi Boilarpur, Horindhara
Hemayetpur, Savar
Dhaka-1340, Bangladesh.
Tel : 9609003304

Marketing Office :
House-28 (1st Floor)
Road-6/B, Sector-12, Uttara
Dhaka, Bangladesh.
E-mail : btlmarketing@babylon-bd.com

Corporate Office :
2-B/1, Darussalam Road, Mirpur
Dhaka-1216, Bangladesh.
Tel: 9023495-6, 9025495, 9023460,
9023462-63, 9007175,9010533, 8011089
Fax: 880-2-8015128

Web: www.babylongroup.com

Corporate Office:
2-B/1, Darussalam Road, Mirpur, Dhaka-1216, Bangladesh
Tel : +8809609003300
E-mail : babylon@babylon-bd.com
Web : www.babylongroup.com
www.babylonkathokata.com